প্রেতাত্মার কবলে মনীষীরা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০।২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

স্নেহের

অরুণ ও ছন্দাকে

●

বাবা

এই লেখকের অন্যান্য বই

সেকালে বড়লোকদের খেয়াল-খুশি (৩য় সং)
মহাভারতের গল্প (২য় সং)
কুলি-কাহিনী (৪র্থ সং) [সম্পাদিত]
জাল প্রতাপচাঁদ [সম্পাদিত]
বিরুদ্ধ-সমালোচনায় বঙ্কিম সাহিত্য
ঐতিহাসিক বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
অবিস্মরণীয় বাল্যকাল
ক্যুইজ অন বিদ্যাসাগর
রাখালদাস রচনাবলী ঃ ১ম, ২য়, খণ্ড (সম্পাদিত
ডঃ শ্রীঅসিত কুমারবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে)

আমার কথা

নিছক ভূত নিয়ে গল্প লিখতে বসিনি। গত বৎসরাধিক কাল যাবত পরলোকচর্চা-বিষয়ে পড়াশোনা ক'রে মনে হয়েছে, বহু মহাপুরুষ, মনীষী ও বিদ্বজ্জন প্রেতাত্মা-বিষয়ে চর্চা ক'রে যে-সব অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, সরাসরি নিজের চোখে দেখে, অনুভব করে দেশী-বিদেশী বহু মনীষী তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে-সব বিস্মৃত অধ্যায়কে আজকের পাঠকের সামনে তুলে ধরা দরকার। কারণ, এই প্রেতচর্চা আজকের দিনে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু একসময় এই ভারতের মাটিতে কী প্রচণ্ডভাবে পরলোকচর্চা হতো তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। পরলোকচর্চাকারী অনেকেই প্রথমে ভূত বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু সবকিছু প্রত্যক্ষ ক'রে, আত্মার সঙ্গে কথা ব'লে, অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে, পরবর্তীকালে তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রেতাত্মা বা ভূতের কবলেও পড়েছেন। সেই সব লোমহর্ষক ভয়াবহ সত্য কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থ।

বাজারে অনেক ছেলেভুলানো ভূতের গল্প আছে, কিন্তু এ-গ্রন্থের উপজীব্য বিষয় নিছক বাজারে প্রচলিত ভূতের গল্প নয়, এ-গ্রন্থ বহু মনীষীর গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষ করা শ্বাসরোধকারী ঘটনাসমূহের অলৌকিক কাহিনীর সমাহার। গ্রন্থের সূচীতে পাঠক এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আজ বিশ শতকের শেষ পাদে বসেও এ-প্রশ্ন আমার মনে জাগে, এই লুপ্তপ্রায় প্রেতচর্চাকে কি আজ আর ফিরিয়ে আনা যায় না বিস্মৃতির অতল থেকে? প্রেততত্ত্ব-অনুশীলনকারী ভারতীয় মনীষী তথা বাংলার প্রেতাত্মাচর্চাকারী বিদ্বজ্জনদের সাধনা কি এ-ভাবেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে? আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে অনেকে ভুলে গেছেন যে, পার্থিব জীবনের শেষে আর একটি জগৎ আছে, সে-জগৎ পারলৌকিক। এই পরলোকতত্ত্ব তো একটা বিজ্ঞান। স্পিরিচুয়ালিজম্। অকাল্ট সায়েন্স (occult science)।

আমাদের এই দেহ পরিত্যাগ করে আত্মা কোথায় যায়, কিভাবে থাকে, সে-আত্মা দেহধারণ করে পুনরায় আমাদের সামনে দেখা দিতে পারে কিনা, তার প্রতিহিংসা-পরায়ণতার রূপটি কি, প্রেতাত্মার প্রতিশ্রুতিরক্ষার তাৎপর্য, আত্মার স্নেহ-মায়া-মমতা থাকে কি না, এ-সব নানা প্রশ্ন আজও আমাদের মনে আলোড়ন তোলে। বহু মনীষীর জীবনে প্রত্যক্ষ করা সত্য ঘটনা আমাদের এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আর সেই সব বিস্মৃত ঘটনা নিয়েই রচিত হয়েছে 'প্রেতাত্মার কবলে মনীষীরা'।

রবীন্দ্রনাথ একসময়ে এই প্রেতচর্চা-বিষয়ক জিজ্ঞাসার উত্তরে মৈত্রেয়ী দেবীকে

বলেছিলেন, 'পৃথিবীর কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে-সব নেই ? কতটুকু জানো ? জানাটাই এতটুকু না-জানাটাই অসীম। এই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এত লোক দলবেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারিনে। প্রকৃতই, এই অজানা জগৎ (unseen universe] সম্বন্ধে অসাধারণ কৌতূহলই ইহলোকের মানুষকে উৎসাহী করে তুলেছে সেই জগৎ সম্বন্ধে জানতে, তাকে প্রত্যক্ষ করতে এবং সর্বপ্রকারে যাচাই করে নিতে। অনেক মনীষীই এই কাজে সফল হয়েছেন।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'যোগমায়া প্রকাশনী'র উদ্যোগে। দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ার ফলে এবার দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন 'শশধর প্রকাশনী'। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা স্মর্তব্য। দীর্ঘদীন যাবত প্রেতাত্মা নিয়ে পড়াশোনা ও ভাবনাচিন্তা করতে-করতে আমিও সময়ে-সময়ে ভূতাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। সে-এক স্বতন্ত্র কাহিনী। গভীর রাত পর্যন্ত এ-সব কাহিনী লিখতে-লিখতে আমিও যেন কখনো-কখনো প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছি, একাত্ম হয়ে গিয়েছি পরলোকচর্চাকারী মনীষীদের সঙ্গে। অনেক দিন আমার সঙ্গে রাতজাগার শ্রমস্বীকার করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায়।

এ-রচনার অনেকের অকৃপণ সাহায্যে প্রীত হয়েছি। এঁদের মধ্যে সুহৃদ্বর শ্রীঅরবিন্দ গুহ (ইন্দ্রমিত্র), অণিমা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীদ্বিজদাস কর, অনুজপ্রতিম কবি ও অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রাহক শ্রীঅমিতাভ গুহঠাকুরতা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডাক্তার দেবাশিস্ বসু, সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রীস্বপন বসু, শ্রীসুনীল দাস, কথাসাহিত্যিক শ্রীঅমল আচার্য, ড. শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে জানাই, আমি এ-গ্রন্থ রচনায় যে-সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য নিয়েছি তার তালিকা গ্রন্থশেষে উল্লেখ করলাম। যে-সব পাঠক এসব কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন না, তাঁদের জোর করে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী হতে বলি না, আবার যাঁরা পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী, তাঁদের অবিশ্বাসী হতে কখনোই সাহায্য করবে না এই 'প্রেতাত্মার কবলে মনীষীরা'। গ্রন্থটি পাঠ করার পর, পক্ষ ও বিপক্ষ—দুটি মত-ই যুক্তিবিচারসহ আমি আশা করি পাঠকদের কাছ থেকে।

করিম বক্স রো গভর্নমেন্ট
হাউসিং এস্টেট
ব্লক : এম-১/ ফ্ল্যাট : ৮
কলিকাতা-৭০০০০২

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

———

কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্রও ভূত দেখে বাড়ি ছেড়েছিলেন

'ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত চোখে যা-কিছু প্রত্যক্ষ করেছি এবং বহুজনের মুখে বিবরণ শুনেছি, তার মধ্যে একটি ব্যাপার—ভূতে পাওয়া। এটা নিছক হিস্টিরিয়া বা অন্য ব্যাধি নয়—বহু বিচক্ষণ চিকিৎসকও তা স্বীকার করেন। এই 'ভূতে পাওয়া'র ঘটনা শুধু এদেশে কেন, বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য দেশেও বিরল নয়। পাশ্চাত্য দেশের সুধীরাও তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং করছেন। এ-ব্যাপার কি? কি রহস্য আছে এর পেছনে?' পার্থিব জগতে এই ভৌতিক রহস্য খুঁজেছেন কেবলমাত্র প্রখ্যাত আইনজীবী সাহিত্যিক সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ই (১৮৮৪-১৯৪৬) নন, বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি এই পরলোকতত্ত্ব বা ভৌতিক রহস্য উদ্ঘাটনে দীর্ঘকাল সাধনা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। পাশ্চাত্য মনীষীদের কথা ছেড়ে দিলেও এদেশের, বিশেষ করে বাংলার মনীষী প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর, ১৮১৪-১৮৮৩), মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-

১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) প্রমুখ অনেকেই এই অলৌকিক আত্মার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এমন কি, প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২), ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ল'অফিসার এবং সৌরীন্দ্রমোহনের মেজকাকা রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল আচার্য, মৃণালকান্তি ঘোষ—সকলেই তো ভূত প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রমাণ করেছেন—ভূত আছে।

মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রের নাগোয়ায় (কাঁথিতে) থাকার সময়ে সেই অলৌকিক একটি ঘটনার বর্ণনা। এটা ১৮৬০-এর কথা। তখনও তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয়নি। এমনকি রচনাও শুরু করেননি। কোনো একটি কাজের জন্য নাগোয়া থেকে বাইরের এক গ্রামে গিয়েছিলেন। হাকিম এসেছেন রাজকার্যে। স্থানীয় জমিদার তাঁর থাকার জন্যে উদ্যানবাড়ির ঘর ছেড়ে দিলেন। সেখানেই উঠলেন বঙ্কিম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বঙ্কিম ঘরে বসে লেখাপড়ায় আত্মস্থ।

রাত এক প্রহর অতীত। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ সে-ঘরে প্রবেশ করলো একটি মহিলা। সারা অঙ্গ সাদা কাপড়ে আবৃত। হকচকিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুললেন বঙ্কিম।—কে ?

বিস্মিত বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, সেই শ্বেতবস্ত্রে আবৃত রমণীটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকছে। আবার জিজ্ঞেস করলেন বঙ্কিম—কে আপনি ?

কোনো উত্তর নেই। আবার প্রশ্ন—কি চান ? কে আপনি ? এবারও নিরুত্তর। হতচকিত বঙ্কিম উঠলেন বিছানা ছেড়ে—কথা বলুন, কে আপনি ! বঙ্কিম ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন শ্বেতবসনা সেই রমণী-মূর্তিটির দিকে।—কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? আপনি কি চান ?

বঙ্কিমকে এগিয়ে আসতে দেখেই রমণীমূর্তিটি খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। বঙ্কিমও সেই মূর্তিটির অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু একি ! বিস্মিত বঙ্কিম দেখলেন, নারী মূর্তিটি হঠাৎ অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে যেন শুভ্র বসন মিলিয়ে যেতে লাগলো বাইরের আলো-আঁধারীর লুকোচুরিতে। স্তম্ভিত নির্বাক্ বঙ্কিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, রমণীমূর্তি যেন মিলিয়ে গেল বাতাসের সঙ্গে।

না। ভয় পাননি বঙ্কিম। নির্ভীকচিত্ত বঙ্কিম, বিজ্ঞানমনস্ক বঙ্কিম কেবলমাত্র স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন এদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। ঘরে এসে চাকরকে হুকুম দিলেন—তল্পিতল্পা বাঁধো। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাবো। আর এক মুহূর্তও নয় এই ভূতুড়ে বাড়িতে।

অনেকে বলেন, এ-ঘটনা নাকি সত্যি নয়। বঙ্কিম বানিয়ে বানিয়ে এমন সব গল্প বলতেন নাতি-নাত্নীদের কাছে। কিন্তু ভূত সম্বন্ধে তাঁর যে সেই অসমাপ্ত গল্প 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী' ?

বড় ভাই বরদা ছোট ভাই সারদাকে খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করছে —ভূতে বিশ্বাস কর ? ভূত আছে ?

ছোট ভাই ভূতে বিশ্বাস করে না। সে বলে, প্রমাণ কই ? সেই প্রাচীন ঋষির কথা—প্রমাণাভাবাৎ। মহর্ষি কপিল প্রমাণ অভাবে ঈশ্বরকে মানেন না আর আমি ভূত মানবো ?

বড় ভাই চটে উঠে বললো, তাহলে ভূত নেই, ঈশ্বরও নেই। কারণ প্রমাণ-অভাব। তাঁছাড়া প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নয় ?

ছোট ভাই ঠিক বুঝতে পারছিল না, দাদা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই বললো, নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করলেই প্রমাণ হবে। আমি ভূতকে প্রত্যক্ষ করিনি, তাই তাতে বিশ্বাসও করিনে।

বড় ভাই জিজ্ঞেস করলো, তুমি টেম্‌স নদী দেখেছো ? মাথা নাড়লো ছোট—না।

তবে টেম্‌সও নেই।—বললো বড় ভাই।

তা কেন হবে ?—ছোট ভাই তর্ক ছাড়তে রাজি নয়, বললো—যারা প্রত্যক্ষ করেছে, যাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, তারা বলেছে টেম্‌স নদী দেখেছে। তাই আমিও মানি।

বড় ভাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়—ভূতও তো এমন বিশ্বাসযোগ্য একজন-না-একজন দেখেছে।

কে সে ?—ছোটর প্রশ্ন।

মনে কর আমি—এই কথা বলতে বরদার মুখ কালো হয়ে গেল। শরীর রোমাঞ্চিত হলো।

সারদা। তুমি ?

বরদা। তা হইলে বিশ্বাস কর।

সারদা। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জুকে সর্পভ্রম হইতে পারে।

বরদা। তুমি দেখিবে ?

সারদা। দেখিব না কেন ?

বরদা। আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।'

এই গল্পটি লিখতে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন। গল্পটি শেষ করতে পারেননি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অভাবে যারা ভূতে বিশ্বাস করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুক্তির অবতারণা করে বঙ্কিমচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের প্রত্যক্ষীভূত নয় এমন ঘটনাও তো অবিশ্বাস্য নয়। তোমার মানা-না-মানার ওপর যে-মানে তার কিছু যায়-আসে না। হ্যামলেট তার বন্ধু হোরেসিয়োকে যে-কথা বলেছিল, There are more things in heaven and earth Horatio, than the dreamt of in your philosophy, সেই কথাটিই যেন বঙ্কিমের মনে এই গল্প লেখার সময়ে অহরহঃ কাজ করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র প্রায় রোজই দুপুরে খেতে বসে কথা বলতেন তাঁর মৃত স্ত্রী বামাকালীর সঙ্গে

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ওরফে টেঁকচাঁদ ঠাকুরের নাম শোনেননি, এমন বাঙালী কে আছেন? ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক, সাময়িকপত্র-সম্পাদক, নানান জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-পুরুষ, সর্বোপরি 'আলালের ঘরের দুলাল', 'রামারঞ্জিকা', 'গীতাঙ্কুর', 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়,' 'যৎকিঞ্চিৎ', 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের সার্থক লেখক প্যারীচাঁদ। সেযুগে ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে একটি উজ্জ্বলতর নাম।

এ-হেন প্যারীচাঁদ একসময়ে প্রেতচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম জীবনে যে-ব্যক্তি হিন্দুধর্মে আসক্ত ছিলেন সেই ব্যক্তি এক সময়ে ব্রহ্মবাদী হয়ে উঠলেন।

কারণ না থাকলে কাজ হয় না। অর্থাৎ কাজের পিছনে কারণ। প্যারীচাঁদের জীবনে প্রেতচর্চায় আত্মনিয়োগের প্রধান কারণই হলো তাঁর প্রাণাধিকা পত্নীর মৃত্যু। ১৮৬০-এ পত্নী বামাকালী মারা গেলেন। কত বয়সই বা তখন প্যারীচাঁদের। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর। বিপত্নীক হলেন তিনি। বামাকালী ছিলেন খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা।

অত্যন্ত পতিপরায়ণা। ছায়ার মতো দিনরাত্রি ঘুরে বেড়াতেন প্যারীচাঁদের আশপাশে দুঃখসুখের অংশীদার হয়ে। প্যারীচাঁদও ভালোবাসতেন তাঁর স্ত্রীকে প্রাণের অধিক। সেই স্ত্রী মারা গেলেন। জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুতে ভাবান্তর ঘটলো প্যারীচাঁদের।

পরলোক কী, আত্মার মৃত্যু আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে স্ত্রীকে দেখা যায় কিনা, আত্মার সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা—এসব চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন প্যারীচাঁদ। 'In 1860, I lost my wife, which convulsed me much. I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms'—'On the Soul'-এর ভূমিকায় একথা জানিয়েছেন প্যারীচাঁদ।

পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি পড়াশোনা শুরু করে দিলেন। বিলেত থেকে অনেক বই-পত্র আনালেন! আমেরিকা থেকেও এলো অনেক। যোগাযোগ ঘটলো বিলেত ও আমেরিকার প্রেততত্ত্ব-আলোচনা সভার সঙ্গে। লন্ডনের 'স্পিরিচুয়ালিস্ট,' বোস্টন-এর 'ব্যানার অব্ লাইট' ও বোম্বের 'থিয়োজফিস্ট' পত্রিকায় প্রেততত্ত্ব বিষয়ে লিখতে শুরু করলেন। ৩০ মে, ১৮৮০-তে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব্ স্পিরিচুয়ালিস্ট' সভা। এই সভা প্যারীচাঁদকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করলেন। মিস্টার জে. জি. মিউগেন্স (J. G. Meugens) হলেন সভাপতি। বিখ্যাত নরেন্দ্রনাথ সেন হলেন সম্পাদক। এর আগেই লন্ডন থেকে 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব্ স্পিরিচুয়ালিস্ট' তাঁকে অনারারি করেসপন্ডিং মেম্বর মনোনীত করেছেন।

অর্থাৎ, দেশ-বিদেশে প্যারীচাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়লো 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' হিসেবে। ১৮৭৯-তে ওলকট্ ও ব্লাভৎস্কি এলেন বোম্বে। প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানে 'থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'। ১৮৮২-র ১৯ মার্চ একা ওলকট্ এলেন কলকাতায়। ৬ এপ্রিল এলেন ব্লাভৎস্কি। এই দিনই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। এরও সভাপতি নির্বাচিত হলেন প্যারীচাঁদ। তাঁরই সভাপতিত্বে ২ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে এই সভার পাক্ষিক অধিবেশন বসতো।

উদ্দেশ্য ছিল 'to prome the study of the esoteric religious philosophies of the East.'

কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ ও প্রেততত্ত্ব কি সমগোত্রের? 'রিলিজিয়াস ফিলোজফি' এবং 'স্পিরিচুয়ালিজম্' কি এক? প্যারীচাঁদ বললেন, 'The end of Spiritualism is Theosophy. Spiritualist and Theosophists should, therefore be united and bring their thoughts to bear on this great end, আর সেজন্যই কি 'রিলিজিয়াস' কথাটির আগে 'এসোটেরিক' শব্দটি বসানো হয়েছে? যা গুপ্ত, যা অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ রহস্যমূলক বা গূঢ়—তাই-ই তো 'এসোটেরিক'।

৩ চার্চ লেনের একটি ঘরে প্লানচেটে বসতেন প্যারীচাঁদ। সঙ্গে থাকতেন আরও কয়েকজন অনুরাগী। পরে বাড়িতে এ-সবের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছিল যে, পরলোকের এই গূঢ় রহস্যসন্ধানে সর্বদা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। তাই বোধ করি স্ত্রীকে যখনই তিনি একাগ্রভাবে চিন্তা করতেন তখনই স্ত্রী তাঁর সামনে হাজির হতেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন অসামান্য মিডিয়ম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, মৃত্যু জীবনের রূপান্তর। তিনি বলতেন, 'সন্তান মাতৃগর্ভে থাকে। যখন মাতা ঐ সন্তানকে গর্ভে ধারণ না করিতে পারেন তখন সন্তান প্রসব হয়। আত্মা তেমনি শরীরে থাকে। শরীর আত্মাকে ধারণ করে, অশক্ত হইলে আত্মা শরীর হইতে প্রসবিত হয়। সন্তানের প্রসব আমরা দেখিতে পাই, আত্মার প্রসব আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যাহা অদ্রষ্টব্য তাহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। যাঁহাদিগের অন্তরদৃষ্টি প্রকাশিত, তাঁহারা অশরীর আত্মার গতি দৃষ্টি করিতে পারেন।' (যৎকিঞ্চিৎ)

প্রকৃতই, এই অন্তরদৃষ্টি নিয়ে প্যারীচাঁদ তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেতেন, কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে। তিনি বিশ্বাস করতেন মিউগেন্স-এর সেই কথাঃ Spirit can appear before us in materialised form.

আর এই দেখাটা ঘটতো তাঁর দুপুর বেলায় খাওয়ার সময়ে। এটা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। বাড়ির লোকজন, পুত্র-পুত্রবধূরা এ-ঘটনা

জানতেন। তাই তাঁরা কখনোই আশ্চর্য বোধ করতেন না। পুত্রেরা জানতেন বাবার খাবার ঘরে ঐ সময়ে মা আসবেনই। আর পুত্রবধূরা শাশুড়ির মৃত আত্মাকে নিয়েছিলেন একান্ত আপন করে। তাই তাঁরা ভয়ও পেতেন না, কৌতূহলও বোধ করতেন না। দরজা-বন্ধ পাশের ঘর থেকে তাঁরা কতদিনই তো শুনেছেন বাবামশাই খাবার সময় মৃত মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের মনে হতো, মা, পাশে বসেই বাবার খাওয়ার তদারকি করছেন।

প্যারীচাঁদের দুপুরে খাওয়ার সময় পুত্রবধূরা তাই কেউই তাঁর ঘরে ঢুকতেন না। ঢুকলেও বিরক্ত হতেন প্যারীচাঁদ। শ্বশুরের ভাত বেড়ে, আসন পেতে দিয়ে, প্রয়োজন মতো সব কিছু রেখেই পুত্রবধূরা বেরিয়ে আসতেন ঘর থেকে। শ্বশুরমশাই খেতে বসলেই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিতেন তাঁরা।

সেদিনও তাঁরা তাই করেছেন। কিন্তু প্যারীচাঁদের এক ভাইঝির কৌতূহল, সে দেখবে তার মৃত জ্যাঠাইমাকে। চুপ করে গভীর আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বসে আছে সে। দৃষ্টি নিবদ্ধ তার ভেজানো দরজার সামান্য ফাঁকটুকুর দিকে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে তার জ্যাঠামশাইকে। খাবার থালার সামনে পাতা আসনের ওপর এসে বসেছেন তিনি।

ভাত খাচ্ছেন প্যারীচাঁদ। অনুভব করলেন স্ত্রী এসেছেন।

কিগো, এত তাড়া কিসের তোমার? এমনভাবে খাচ্ছো যে?—পাশে বসে বামাকালীর ছায়ামূর্তি প্রশ্ন করলেন।

আমার একটু তাড়া আছে। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে—যেন জীবন্ত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন প্যারীচাঁদ। এমন স্বাভাবিক, আর এমন সরল তাঁর আচরণ, যেন এ-ব্যাপারটি কিছুই নয়। আবার বললেন প্যারীচাঁদ, জানো, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ফেলো নির্বাচিত করেছে।

শুনে খুব ভালো লাগছে আমার। কিন্তু শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি দাও। জানি, আমার পুত্রবধূরা তোমাকে খুবই আদরযত্ন করে, তবুও শরীরটা তো তোমার!—ছায়ামূর্তি দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

হাসলেন প্যারীচাঁদ। জানো, তোমার ছোট ছেলে মতির খুব ব্যামো। মনটা তাই ভালো নেই।

জানি। মতিকে আমি নিয়ে যাবো। ওখানে আমি বড় একা।

কেঁপে উঠলেন প্যারীচাঁদ। কি বলছো তুমি?—আশ্চর্য বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন নির্বাক্ হয়ে ভাতের থালার দিকে।

বাইরে বারান্দায় বসে সব দেখতে পাচ্ছিল ভাইঝিটি। এ যেন সেই জ্যাঠাইমা। লাল-পেড়ে গরদ পরনে। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। এ কি করে হয়! ভূত দেখার মতো অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো সে—জ্যা-ঠা-ই-মা—। তারপরেই অজ্ঞান।

হঠাৎই ছায়ামূর্তিটি বিলীন হয়ে গেল হাওয়ায়। সবাই ছুটে এসে ধরাধরি করে তুললো মেয়েটিকে। চোখে-মুখে জল দিতে কিছুক্ষণ বাদেই সুস্থ হয়ে উঠলো সে।

কি দেখেছিলি? এমন অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন?—সবারই এক প্রশ্ন।

দেখেছিলাম আমার মৃত জ্যাঠাইমাকে। ঠিক, আগে যেমনটি ছিলেন মরার পরেও ঠিক একই রকম। সেই মুখ, সেই শরীর।

মিউগেন্স-এর সেই উক্তি: Spirit can appear before us in materialised form.

ছোটছেলে মতির কথা উল্লেখ করলেন না প্যারীচাঁদ। গম্ভীর মুখে আহার ত্যাগ করে উঠে পড়েছিলেন সেদিন।

পরের দিনই মতি মারা গেল। কান্নাকাটির রোল উঠলো আকাশে-বাতাসে। প্যারীচাঁদ কিন্তু ধীর-স্থির-আত্মমগ্ন। মতি মরেনি। আমার কাছ থেকে গেছে মায়ের কাছে। পৃথিবীর বাসস্থান থেকে পরলোকের বাসস্থানে। দেশ থেকে বিদেশে। 'পূর্বেই বলিয়াছি যে আত্মা অমর। যদি আত্মা অমর তবে তাহার বাসস্থান কি নাই? যদি আত্মার বাসস্থান না থাকে তবে আত্মার অবিনাশিত্বের কি প্রয়োজন? আত্মার উন্নতিসাধন জন্যই আত্মার বাসস্থানের আবশ্যক। আত্মার অবিনাশিত্ব স্বীকার করিলে, পরলোক মানিতে হইবে।'—এই প্রত্যয় ছিল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত প্যারীচাঁদের অন্তরে।

আর একদিনের ঘটনা।

তিন নম্বর চার্চ লেনের বাড়িতে প্ল্যানচেট বসলো। ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র নিয়ে এলেন মিডিয়ম নিত্যরঞ্জন ঘোষকে। রাজকৃষ্ণ ছিলেন তখনকার দিনের খুব নামকরা ডাক্তার। সম্মোহনবিদ্যায় পারদর্শী। অনেক অসুস্থ

রোগীকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন এই হিপনোটিজম বা সম্মোহনবিদ্যার বলে। তাছাড়া শিশিরকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে মিত্রতার সূত্রে ছিলেন আবদ্ধ। কবি হিসেবে যেমন তাঁর নাম ছিল, প্রেতাত্মা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'শোক-বিজয়' (১৮৮১) লিখেও খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ গ্রন্থ তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল।

ইনিই নিয়ে এলেন মিডিয়ম নিত্যকে। টেবিল-ঘিরে সবাই একাগ্র-চিত্তে ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো নিত্য। মুখে অবিরাম খই ফুটছে—এমন করে কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও? বার বার তোমরা আমাকে কেন ডাকো ? কী ভেবেছো তোমরা—বলতে বলতে নিত্য এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের একটা নিম গাছের ডালে এক লাফে উঠে পড়লো।

পাশে বসা মিউগেন্স সাহেব, রাজকৃষ্ণবাবু টেবিল ফেলেই নিত্যর পিছু-পিছু ধাওয়া করলেন। গিয়ে দেখেন বেশ উঁচু একটা ডালে বসে রয়েছে নিত্য। মিডিয়ম নিত্যরঞ্জন ঘোষ।

মিউগেন্স বললেন, এমন তো কখনও দেখিনি। এ-যে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।

রাজকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি ? তোমাকে তো ডাকিনি ! তুমি নিচে নেমে এসো।

না। যতদিন আমার আত্মার সদ্গতি না করতে পারো ততদিন সুযোগ পেলেই আমিই আগে মিডিয়মকে ভর করবো। কাউকে আর আসতে দেব না তোমাদের ডাকে।

কিন্তু আগে বল তুমি কে ? তোমার সদ্গতিই বা কী করে করবো ?

উত্তর হলো মিডিয়মের মুখেঃ আমার নাম ভোলানাথ মুখার্জী। বাড়ি যশোহরে। দু'বছর আগে আমার বৌ মারা গেছে। তার শোকেই আমার মৃত্যু। কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। এখানে সব খুন হওয়া, গলায় দড়ি দেওয়া আত্মারা থাকে। সবাই নীচশ্রেণীর। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো। আমি আর কোনোদিনই আসবো না।

তোমার উদ্ধারের পথটা বলে দাও।

মিডিয়মের মুখে আবার জড়িত উত্তর : গয়ায় একটা পিণ্ডি দাও আমার নামে। তাহলেই আমি এই বাসস্থান ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে যাবো।

তাই হবে।

আঃ! বাঁচলাম! বলেই মিডিয়ম নিত্যরঞ্জন গাছের ডালটি ভেঙে নিচে ধপাস্ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

ধরাধরি করে নিত্যকে ঘরে তুলে আনা হলো। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরলো নিত্যর। মাথায়, ডানহাতে অসহ্য ব্যথা। অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে তার। রাজকৃষ্ণ ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তুললেন তাকে। বললেন, এ-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

মিস্ লী'র প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নিয়েছিল খুনী সার্প ও তার সর্বনাশকারী ওয়াকারের বিরুদ্ধে

পাড়ায় ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে। মিস লী গর্ভবতী। কিন্তু এ কাণ্ডটি ঘটালেন কে ? ওয়াকারের বাড়িতে অন্য আর কে আছে যে কুমারী লীকে নিয়ে সহবাস করবে ? না। আর কেউ নেই। ইংল্যান্ডের ডারহাম-শায়ারের চেস্টার-লি স্ট্রীটের বাসিন্দা মিস্টার ওয়াকার একাই তাঁর বাড়িতে বাস করেন।

বিয়ে করেছিলেন ওয়াকার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রী মারা যান। সেই থেকে তিনি বিপত্নীক। উপার্জনশীল মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্র সন্তান ওয়াকার। খাওয়া-পরার অভাব নেই, কিন্তু খাবে কে ? পরবে কে ? আর কেউ নেই ওয়াকারের। শূন্য গৃহ খাঁ-খাঁ করে। গৃহ আছে, নেই গৃহস্থালী।

এমন সময়ে কুমারী লী এসে উঠলো দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই ওয়াকারের গৃহে।

ওয়াকার বললেন, বেশ তো, আমার অনেক আছে। তুমি এখানে থেকেই ঘরসংসার দেখাশোনা কর। নিশ্চিন্ত হই আমি।

সেই থেকে লীর হাতে ওয়াকারের ঘর-গৃহস্থালীর ভার পড়লো। আর

প্রকৃতই বিপত্নীক ওয়াকারের ঘরের চেহারাই পালটে গেল লীর হাতের ছোঁয়া পেয়ে।

কিন্তু একটা বছরও ঘুরলো না। লীর সুখের জোয়ারে ভাঁটা এলো। লী অন্তঃসত্ত্বা। বেচারী কুমারী লীর কোনোএক দুর্বলমুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ওয়াকার আগুন জ্বালিয়ে দিলেন তার দেহে। পরপর প্রকাশিত হতে লাগলো লীর শারীরিক পরিবর্তন। তার দেহের প্রতি লক্ষ্য পড়লো পাড়াপ্রতিবেশীর। ছিঃ ছিঃ-তে ভরে উঠলো চেস্টার-লি স্ট্রীটের আশ-পাশ। প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাকানি শুরু হলো। লী ও ওয়াকারের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ। কুমারী মেয়ে গর্ভবতী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

এই ছিঃছিঃ-র আগুনে দিনরাত দগ্ধ হতে লাগলেন ওয়াকার। নিষ্কৃতি পাচ্ছে না লীও। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, লী অন্তর্হিতা হয়েছে মার্ক সার্প নামে ওয়াকারের এক বন্ধুর সঙ্গে। কোথায় গেছে একথা কেউ জানলো না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ওয়াকার। পাড়া হলো নিশ্চুপ।

কিন্তু মার্ক সার্পের সঙ্গে কি স্বেচ্ছায় চলে গেল লী? এ-প্রশ্ন কেউ আর তুললো না। আবার সুন্দরভাবে মান-প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করছেন মিস্টার ওয়াকার।

ছ'টি মাসও গেল না। শীতের রাত। ইংল্যান্ডের শীত মানে মৃত্যু-যন্ত্রণা। গাছের পাতা নড়ে না। পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ সবই যেন নিস্তব্ধ। শহরের কিছু দূরে ওয়াকারের বন্ধু জেমস্ গ্রেহামের যাঁতা-পেষার কল। কাজের চাপে গভীর রাত পর্যন্ত কারখানায় একা কাজ করছেন গ্রেহাম। গ্রেহামের বাড়ি ওয়াকারের বাড়ি থেকে মাইল দুই দূরে। রাত অনেক হলো। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কারখানার দরজা বন্ধ করে গ্রেহাম নেমে এলেন রাস্তায়। হাতে লণ্ঠন। ঝির-ঝির করে বরফ পড়ছে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে গভীর রাত। দূরে—অনেক দূরে কুয়াশাচ্ছন্ন ক্ষীণ গ্যাসের আলো দেখা যাচ্ছে।

হন-হন করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন গ্রেহাম। হঠাৎ তাঁর পথ অবরোধ করলো শ্বেতবস্ত্রে আবৃতা এক রমণীমূর্তি। কুয়াশামাখা ক্ষীণ আলোয় এই সময়ে নারীমূর্তি দেখে চীৎকার করে উঠলেন গ্রেহাম—কে তুমি?

কোনো সাড়া নেই। গ্রেহামের আবার জিজ্ঞাসা—কথা বলো, কে তুমি ?

নির্বাক্ নিস্তব্ধ নারীমূর্তি। হাতের লণ্ঠনটি উঁচু করে ধরে নারী-মূর্তির মুখের কাছে আনতেই 'বাপ্‌রে!' বলে কিছুটা পিছু হটে এলেন গ্রেহাম। এ কি দেখলেন তিনি ? মেয়েটির চুল ছাড়া। আলু-লায়িত। মাথার সেই রাশিকৃত চুলের মধ্যে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়। ডান কানের পাশে ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের ক্ষত। সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে আছে চোয়ালে। ভয়ে শির-শির করে উঠলো গ্রেহামের রক্তকণিকা! কোনো প্রেতমূর্তি নাকি ? ভগবানের নাম জপ করছেন তিনি মনে মনে।

কিন্তু প্রেতিনী হলে এমন ভাবেই বা তাঁর সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কেন নারীমূর্তি! তাছাড়া, মরা মানুষের দেহে এত রক্ত আসবে কোত্থেকে। মানবী নয় তো ?

দুই হাত দিয়ে ভালো করে চোখ দুটো রগ্‌ড়ে নিলেন গ্রেহাম। চোখের ভুল নয় তো ? কিন্তু এত রাতে এই মাঠের মধ্যে নারীমূর্তিই বা আসবে কোত্থেকে ?

এসব চিন্তা করতে করতে সম্বিত ফিরে পেলেন গ্রেহাম। আবার খুব জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—এত রাত্রিতে কে তুমি ? পরিচয় দাও তোমার। তোমার এ-অবস্থা হলো কী করে ?

এবার রমণীমূর্তি তার গা থেকে সাদা কাপড়টি উড়িয়ে দিল বাতাসে। তারপর যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে বলতে শুরু করলো ঃ গ্রেহাম, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না। আমি তোমার বন্ধু ওয়াকারের বাড়িতে ছিলাম। আমি সেই লী।

চমকে উঠলেন গ্রেহাম। তুমিই লী ? কিন্তু এখানে কেন ? তুমি তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে সার্পের সঙ্গে।

না না, গ্রেহাম, পালাইনি। সত্য কথাটি বলবার জন্যে আজ আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি এর প্রতিকার কর।

আমি তখন গর্ভবতী। ওয়াকার রাতের পর রাত আমাকে উপভোগ করেছে। একে বাড়িতে আর কেউ নেই তার ওপর আমি তার আশ্রিতা।

কোনো প্রতিবাদেই আমার কাজ হয়নি। কিন্তু যখন লোকজানাজানি হয়ে গেল তখন ওয়াকার আমাকে একদিন বললে, দেখ, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তোমাকে একটি নির্জন স্থানে পাঠাবো। সেখানে তোমার প্রসব করার সব ব্যবস্থাই আমার বন্ধু করে দেবে। কিছুদিন সেখানে থেকে সুস্থ হবার পর আবার তোমাকে আমি ফিরিয়ে আনবো।

আমি ভালো মনে ওয়াকারের বন্ধু সার্পের সঙ্গে একদিন মাঝরাতে বাঁচার জন্যে ঘর ছাড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে জনশূন্য এক বিলের কাছে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। লোহার রড দিয়ে সার্প আমার মাথায় আঘাত করেছে। আর সেই মুহূর্তে আমার আত্মা স্থূল দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এলো হাওয়ায়। আমি দেখলাম, আমার রক্তমাখা নির্জীব দেহটাকে নিয়ে টানতে টানতে সার্প কাছেই এক কয়লার গর্তে ফেলে দিল।

তুমি মৃত? তুমি ভূত?—চীৎকার করে উঠলেন গ্রেহাম।

ভয় নেই গ্রেহাম, তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।—লী-এর প্রেতাত্মা বলে চললো, এর প্রতিশোধ তোমাকে দিয়েই আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমার কথামতো যদি কাজ না কর তাহলে তোমার রক্ষে নেই।

নিশ্চল পাথর গ্রেহামের দেহ! ভয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনো রকম শব্দ করারও উপায় নেই তাঁর।

প্রেতাত্মা আবার বলতে শুরু করলো, সার্পের জুতো ও মোজাতেও রক্ত লেগে গিয়েছিল। তাই সে জুতো ও মোজা খুলে আমার দেহের সঙ্গে ঐ গর্তেই ফেলে দিয়েছিল। তারপর সেই দুর্বৃত্ত দ্রুতপদে সেখান থেকে পালিয়েছিল।

দেখ গ্রেহাম, আমি প্রতিহিংসার আগুনে দিবারাত্র জ্বলছি। তুমি দয়া করে আমার এই জ্বালা জুড়োবার ব্যবস্থা করে দাও। তুমি আমার এই ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ কর।—প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে এলো—তা যদি না কর তাহলে তোমার মৃত্যু আমার হাতে। কথা কটি বলতে বলতে সেই নারীমূর্তি ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

গ্রেহাম দেখলেন মূর্তিটির গায়ে বাতাসে উড়ে এলো একটি শ্বেতশুভ্র আচ্ছাদন। ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে আত্মবিস্মৃতের মতো গ্রেহাম বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন গ্রেহাম। কিন্তু ঘুম এলো না। সারারাত অস্বস্তিতে কাটালেন। এ কী করে সম্ভব? পরলোকগত আত্মার অবিনশ্বর সূক্ষ্ম শরীরে জড়দেহের ক্ষতচিহ্ন থাকা কি সম্ভব? বিছানায় ছটফট্ করছেন গ্রেহাম। তবে কি প্রয়োজন হলে পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের সব অবস্থাই পরলোকগত আত্মা দেখাতে সক্ষম? কোনো ব্যাখ্যাই গ্রেহামের চিন্তায় স্থায়ী হতে পারছে না। তবে কি চোখের ধাঁধা? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? অনেকটা সময় ধরে তো তিনি সেই প্রেতাত্মার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছিলেন! প্রত্যক্ষ করেছেন মাথায় ক্ষতস্থান। রক্ত।

চিন্তার মধ্যেই ভোর হলো। গ্রেহাম কাল রাতের ঘটনা কাউকেই কিছু বললেন না। তবে খুব সতর্ক হয়ে রইলেন কারখানায় যাতায়াতের সময়। দেখি না কি হয়! —এমন একটা ভাব নিয়ে গ্রেহাম চলাফেরা করতে লাগলেন।

দিন পাঁচ-ছয় গড়িয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার পুরো-পুরি গ্রাস করতে পারেনি ফাঁকা মাঠটি। কারখানার ঘরেও আলো-আঁধারীর ছায়া। হঠাৎ গ্রেহাম দেখতে পেলেন ঘরের এক কোণে সেই শ্বেতবসনা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার কাতরতার লেশমাত্র নেই, আছে এক কর্কশ কাঠিন্য। চমকে উঠলেন গ্রেহাম। —আবার এসেছো তুমি?

কেঁপে উঠলো প্রেতিনীর ঠোঁট।— তুমি আমার কথা রাখলে না গ্রেহাম। এখনও যদি আমার কথামতো না চলো তাহলে তোমার নিস্তার নেই। আমার সব ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাও, নচেৎ—শেষের কথাগুলো আর শুনতে পেলেন না গ্রেহাম। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন যাঁতাকলের ওপর।

গ্রেহামের যখন জ্ঞান ফিরলো তখন অনেক রাত। কোনো রকমে কার-খানার কপাটটি বন্ধ করে বাড়ি ফিরলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে। না। এদিনের ঘটনাও কাউকে প্রকাশ করলেন না গ্রেহাম। কিন্তু কারখানায় যাওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি পরের দিন। তাঁর জিদ্ চেপে গেল, দেখি না কিভাবে প্রেতাত্মা তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। ভয়? না। তাহলে তো প্রথম দিনেই তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? তাহলে কারখানায় যাওয়াই বা বন্ধ করলেন কেন? এর সদুত্তর

গ্রেহাম খুঁজেই পান না। লোকের মুখে শুনেছেন তিনি, এমন ঘটনাও নাকি অতিপ্রাকৃত নয়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি কই ? যাহোক, এবারও নিজের মধ্যে তিনি চেপে রেখে দিলেন ঘটনাটি।

সেদিন খ্রীস্টমাস। আনন্দ-উৎসবের বান ডেকেছে শহরে। গ্রেহাম সাহেব নিজের বাগানে পায়চারি করছেন সন্ধ্যায়। সঙ্গে আর কেউ নেই। হঠাৎ অদূরে আবার সেই প্রেতিনীমূর্তি। কেঁপে উঠলেন গ্রেহাম। এবার মূর্তিটির চোখ দুটো দিয়ে ধক্-ধক্ করে যেন আগুন বেরুচ্ছে। ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখ।

এখন আর পালাবি কোথায় ? আজ আমার হাতে তোর মৃত্যু ! —তীক্ষ্ম স্বর প্রেতিনীর মুখে। ধীরে ধীরে গ্রেহামের দিকে এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন গ্রেহাম। হাত জোড় করে মিনতির স্বরে গ্রেহাম বললেন, দোহাই তোমার, আমি শপথ করছি, কালই ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবো তোমার কথা। আমায় ছেড়ে দাও তুমি !

মূর্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো।

ভোর হতেই গ্রেহাম ছুটলেন ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে। আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানালেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু এ-ঘটনা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, এ উপন্যাস। বাস্তব নয়।

স্যর ! এ-ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে আপনি দয়া করে অনুসন্ধান করুন।

আচ্ছা দেখা যাবে।—বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাচ্ছিল্যভরে গ্রেহামকে বিদায় দিলেন।

দুপুরে কোর্টে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কোচোয়ান তৈরি। গাড়িতে গিয়ে বসতেই, দেখেন তাঁর সীটের পাশে বসে রয়েছে শাদা কাপড়ে সর্বাঙ্গ-ঢাকা এক নারীমূর্তি। বিস্মিত ও রাগতভাবে কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—আমার গাড়িতে এ কে ?

কোচোয়ান তার সীট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে এলো ভয়ে। গাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়ে বললো, কাকেও তো দেখছি না হুজুর'

কি বাজে বকছো ? আমার সীটে একজন মহিলা বসে রয়েছেন দেখতে পাচ্ছো না ? তারপর মহিলাটিকে বললেন, এই ! নেমে এসো গাড়ি থেকে।

হঠাৎ নারীমূর্তির মাথার আবরণটা ধীরে ধীরে খসে পড়লো। ভয়ে আঁৎকে উঠলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। এই সেই নারী! মাথায় ক্ষত-চিহ্ন। কানের পাশে জমাট রক্তের দাগ। আজ সকালেই তো গ্রেহাম তাঁকে এর ঘটনাই বলে গেছে। বিস্মিত ম্যাজিস্ট্রেট মূর্তিটিকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার সকল ঘটনাই আমাকে গ্রেহাম বলেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এর অনুসন্ধান করে দোষী ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দেবই।

ধীরে ধীরে শ্বেতবস্ত্রে আবৃতা নারীমূর্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

কোচোয়ানকে হুকুম দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট—গাড়ি চালাও।

অধিকতর বিস্মিত কোচোয়ান মনিবের এই আচরণে ও কথাবার্তায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দ্রুত তার আসনে গিয়ে বসলো। হাওয়ার সঙ্গে কোনো সুস্থ ব্যক্তি যে কথা বলতে পারে, কোচোয়ান এই প্রথম দেখলো। হুজুরের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ?

কোর্টে গিয়েই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিলেন। গ্রেহামের কথামতো পুলিশ সার্জেন্ট প্রথমেই গেলেন সেই বিলে, যেখানে কুমারী লীকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছিল। পাওয়া গেল লীর পচা শব। না, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শবদেহ গলে যায়নি। পরীক্ষা করে দেখা হলো শবের ক্ষতস্থান। এমনকি, চাপ-চাপ রক্তের দাগও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি কানের ওপর থেকে। গর্ত থেকে সার্পের জুতো-মোজাও পাওয়া গেল রক্তমাখা অবস্থায়। আর পাওয়া গেল সেই ডাণ্ডাটি—যেটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল লীর মাথায়।

পুলিশ সব সূত্র পেয়ে গ্রেপ্তার করলো ওয়াকার ও তার বন্ধু সার্পকে। দোষ স্বীকার করলো তারা। ডারহামের আদালতে বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হলো। সার্পের হলো মৃত্যুদণ্ড আর ওয়াকারের দশ বছরের জেল।

পরলোকগত লী তার হত্যার চরম প্রতিহিংসা গ্রহণ করলো জেম্‌স গ্রেহামকে দিয়ে। আর ওয়াকার ও সার্প পেলো কর্মফলের প্রকৃত দণ্ড।

মহাত্মা শিশিরকুমার প্রেতাত্মা দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর মৃত পুত্র পয়সকান্তির

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে (১৮৪০-১৯১১) জানেন না কে? প্রখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। সারা ভারতবর্ষে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল অবিসংবাদী। একসময় প্রেতচর্চায় ঝুঁকেছিলেন। কলকাতায় ১৯০৭-এ প্রতিষ্ঠিত সাইকিক্যাল সোসাইটির অন্যতম ভাইস প্রেসিডেণ্ট তিনি। এই সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রেতাত্মবাদ প্রচার। এসম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করলেন ১৯০৬-এর মার্চে। নাম তার 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন'। কলকাতায় থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির গোড়াপত্তনও তিনি করেছিলেন মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্নেল অলকটের সহায়তায়।

শিশিরকুমার প্রেতাত্মবাদ শিক্ষা করার জন্যে একসময় আমেরিকায় যাবেন ভেবেছিলেন। কারণ তাঁর জানা ছিল আমেরিকায় প্রেতচর্চা খুবই উন্নতিলাভ করেছে। কেন ঝুঁকেছিলেন শিশিরকুমার এই প্রেতচর্চায়? কারণ শিশিরকুমারের প্রিয়তম সহোদর হীরালাল যেদিন আত্মহত্যা করে, সেদিন থেকেই শিশিরকুমার পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। ভ্রাতৃ-বিয়োগের নিদারুণ যন্ত্রণা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না।

শোকতাপে জর্জরিত শিশিরকুমার তাই স্থির করলেন প্লানচেটের মাধ্যমে ভাই হীরালালের আত্মার সঙ্গে একবার কথা বলবেন।

উপায়ও একটা হয়ে গেল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) কর্মোপলক্ষে তখন যশোহরে। তিনি সেসময় প্লানচেটের মাধ্যমে মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলতেন। শুধু প্যারীচাঁদই নন। তাঁদের এই দলে ছিলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব-জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এঁরা সকলেই প্রেতাত্মা-চর্চায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। এঁদের লীডার ছিলেন প্যারীচাঁদ। প্রেতচর্চায় তিনি ভালোভাবে হাত পাকিয়েছেন। প্যারীচাঁদই শিশির-কুমারকে নিজের বাড়িতে বসে প্রেতচর্চা করার শিক্ষা দিতে লাগলেন।

শিশিরকুমার ভাইদের নিয়ে পারিবারিক প্লানচেটে বসলে অধিকাংশ সময়ে তাঁর মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ও কনিষ্ঠ মতিলালের দেহেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হতো। মৃত হীরালাল ছিলেন মতিলালের পরের ভাই। তাঁর তৃতীয় পুত্র পয়সকান্তি ও কনিষ্ঠা কন্যা সুহাসনয়নাও ভালো 'মিডিয়ম' ছিলেন। সাধারণত কোমলস্বভাবের লোকেরাই প্লানচেটের মিডিয়ম হতে পারে।

সেদিন পারিবারিক চক্রে বসলেন শিশিরকুমার তাঁর ভাইদের নিয়ে। নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে লাগলেন হীরালালের। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ হেমন্তকুমার আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। শরীর কাঁপছে তাঁর ঠকঠক করে। শিশিরকুমার বুঝলেন হেমন্তর শরীরে প্রেতাত্মা ভর করেছে। কাগজ ও পেনসিল আগেই টেবিলে মজুত ছিল। পেনসিলটা সঙ্গে সঙ্গে গুঁজে দিলেন হেমন্তর হাতে। হাতের নিচে শাদা কাগজ।

পেনসিলটা হাতে নিয়ে কাগজের ওপরে ঠকঠক করে কয়েকটি আওয়াজ করলো হেমন্তকুমারের হাত। সঙ্গে সঙ্গে শিশিরবাবুর জিজ্ঞাসা ঃ তুমি কি হীরালালের আত্মা এসেছ ?

কাগজে লেখা হলো—হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ তুমি এখন কোথায় ?

উত্তর ঃ আমি এখন যেখানে আছি, সেখানটা জড়জগৎ অপেক্ষা মনো রম।

প্রশ্ন ঃ গত তিন দিন ধরে তোমাকে আনবার চেষ্টা করছি। তুমি আসছো না কেন ?

উত্তর ঃ আমাকে অনেক নীচশ্রেণীর নাস্তিক আত্মা বাধা দিচ্ছে তোমাদের কাছে যেতে।

প্রশ্ন ঃ আজ কী করে এলে ?

উত্তর ঃ তোমাদের ছেড়ে এসে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাই সকল বাধা ঠেকিয়ে চলে এসেছি তোমার সঙ্গে কথা বলতে। এখানে নাস্তিক আত্মার অভাব নেই। তারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ হেমন্তকুমারের হাত থেমে গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে কেঁদে উঠলেন। হঠাৎ চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি। শিশিরকুমার গিয়ে ধরে ফেললেন মোহাবিষ্ট হেমন্তকুমারকে।

সেদিন মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন শিশিরকুমার প্রাণাধিক ভাইয়ের মৃত-আত্মার সঙ্গে কথা বলে।

আমেরিকায় সেসময় অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছে প্রবলভাবে। ডক্টর পিব্‌ল্‌স (J. M. Peebles), এম. এ., এম. ডি., পি-এইচ. ডি, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি তখনকার দিনে অধ্যাত্মবাদিগণের অন্যতম বিশেষজ্ঞ। শিশিরকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল পত্রের মাধ্যমে। শিশিরকুমারের স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন পড়ে শতমুখে প্রশংসা করেছিলেন পিব্‌ল্‌স সাহেব। বলেছিলেন,'...its contents are interesting, instructive and very valuable. I read it with a great degree of pleasure.'

পিব্‌ল্‌স সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন ১৯০৭-এর ৪ জানুআরি। এসে উঠেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে তাঁরই টেগোর ক্যাসেলে। শিশিরকুমারের সাহায্যে ভারতে প্রেতচর্চার প্রচার সুগম হয়েছিল ডক্টর পিব্‌ল্‌সের।

পত্রপত্রিকা মারফত এবং লোকমুখে শিশিরকুমার জেনেছিলেন আমেরিকায় এর চর্চা চলছে সাফল্যজনকভাবে।

এই সময়ে শিশিরকুমারের তৃতীয় পুত্র পয়সকান্তি মারা যান মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে। পুত্রবিয়োগে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ জানতে পারলেন, আমেরিকার শিকাগো শহরে একটি পরিবারের

দুটি বোন অলৌকিক শক্তিবলে মৃত ব্যক্তির ছবি আঁকান। মৃতব্যক্তির কোনো ছবি বা ফোটো না দেখেই এ-কাজ তাঁরা করিয়ে দেন। এঁরা ব্যাংকস্ পরিবারের বলে এঁদের সবাই ডাকতো "Banks Sisters' নামে। শিশিরকুমার মনঃস্থ করলেন, যত টাকা খরচ হোক ব্যাংকস্ সিস্টার্সকে দিয়ে পয়সকান্তির একখানা অয়েল পেন্টিং করিয়ে নেবেন।

চিঠি লিখলেন শিকাগোয় তাঁর এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটির কিন্তু পরলোকগত আত্মার ব্যাপারে একেবারেই অবিশ্বাস। তিনি পত্রের উত্তরে জানিয়ে দিলেন শিশিরকুমারকে, এসব একেবারেই গাঁজা। হুজুগে মেতে কেন অর্থের অপচয় করবেন!

শিশিরকুমারের কিন্তু জিদ্। তিনি আবার অনুরোধ করে পত্র লিখলেন শিকাগোর বন্ধুকে, আপনি যেমন করে হোক পয়সকান্তির ছবিটি ব্যাংকস্ ভগ্নীদের দিয়ে আঁকিয়ে দিন।

প্রেতাত্মায় অবিশ্বাসী বন্ধুটি ফেলতে পারলেন না শিশিরকুমারের অনুরোধ। লিখলেন, ঠিক আছে, আমি বোন দুটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আপনি টাকা পাঠান। আর হ্যাঁ, পয়সকান্তির একখানি ফোটোও আমাকে পাঠাবেন। ফোটোটি আমার কাছেই থাকবে। ছবি আঁকার পর মিলিয়ে দেখবো ছবি ঠিক হয়েছে কিনা!

মনে মনে স্থির করে ফেললেন, দেখি, বোন দুটির বুজরুকি! এবার কীভাবে ওঁরা সামলান দেখা যাক্!

শিশিরকুমারও অনুরোধ করে পাঠালেন, ছবি শেষ হবার আগে ওঁদের পরিচিত কেউই যেন এই ফোটোর কথা জানতে না পারে।

শিশিরকুমারের কাছ থেকে টাকা ও ফোটো পেয়ে বন্ধুটি তাঁর আর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ব্যাংকস্ বোনেদের বাড়িতে। এ-ভদ্রলোকও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন।

সেদিন ব্যাংকস্ বোন দুটির একজন মাত্র বাড়িতে ছিলেন। তিনি সাদরে এই দুই ভদ্রলোককে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুপুরবেলা। একটিমাত্র খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রচুর আলো আসছে।

বন্ধু দু'জন বসেছেন একটি শোফায়। তার সামনে এসে বসলেন ব্যাংকস্-ভগ্নী। বললেন, আমি আমার নিজের ক্যাম্বিশের ওপর ছবি আঁকবো না, আপনি দেবেন?

বন্ধু বললেন, তার ব্যবস্থা আগেই করেছি। বলে হাতের একটি লম্বা মোড়ক খুলে এক টুকরো ক্যাম্বিশ কাপড় ব্যাংকস্-বোনের হাতে দিলেন।

খুশি হয়ে বোনটি ক্যাম্বিশখানি খোলা জানালার সামনে ঝুলিয়ে দিলেন। জানালার নিচেই সদর রাস্তা। বন্ধু দু'জন নির্বাক্ হয়ে ঘরের সব জায়গাটা দেখে নিলেন। না, বাইরে থেকে এসে এখানে কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় ছবি আঁকার। ঘরে মাত্র তিনজনই ওঁরা।

ঢং ঢং করে দূরে গীর্জার ঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজলো। বাইরে প্রখর রৌদ্রের তেজ। ক্যাম্বিশ ভেদ করেও ঘরে বাইরের আলো আসছে। বন্ধু দু'জনের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ক্যাম্বিশের ওপর। দেখাই যাক না, অদৃশ্য হাতে কীভাবে ছবি আঁকা হয়!

বোনটি এবার জানালার কিছু দূরে গিয়ে বসলেন যোগাসন হয়ে একটি কাঠের চারপায়ার ওপর। মুখটা দেওয়ালের দিকে। বন্ধু দু'জন আড়-চোখে দেখে নিলেন বোনটির দিকে।

প্রায় মিনিট পনেরো আত্মস্থ হয়ে বসে রইলেন বোনটি। বন্ধু দু'জনের মনে হতে লাগলো যেন ধ্যানমগ্না পার্বতী। সাধনার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত তিনি।

হঠাৎ বোনটির তন্দ্রায় আচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল: একটি যুবক। হ্যাঁ—একটি যুবকের মূর্তি আমি দেখতে পাচ্ছি। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কাছাকাছি।...

শিউরে উঠলেন পাশে-বসা বন্ধু দু'জন।

তারপর চললো মৃত ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা—সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় বলে দিলেন হুবহু চেহারা।

পয়সকান্তির ফোটোর সঙ্গে সবই মিলে গেল। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম প্রেতাত্মায় অবিশ্বাসী বন্ধু দু'জনের।

হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেলেন বোনটি। ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে এলেন ঝোলানো ক্যাম্বিশটার সামনে। ডানহাতটা ক্যাম্বিশে ছুঁয়ে বললেন, আপনারা যার ছবি নিতে এসেছেন তার কোন্ মূর্তির ছবি চান? পার্থিব মূর্তির না পরলোকের?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিলেন তখন বন্ধুরা। বলে কি মেয়েটি! বেঁচে থাকার সময়ের ছবিও আঁকিয়ে দিতে পারে আবার মৃত্যুর পর পরলোকে কেমন দেখতে হয়েছে—সে ছবিও? মনে মনে ঠিক করে ফেললেন বন্ধুটি—পরলোকের চেহারার তো কোনো প্রমাণ নেই আমার হাতে! দেখে মিলিয়ে নেব কেমন করে? তাই বললেন, না, পরলোকের চেহারা নয়। পার্থিব মূর্তির ছবি চাই।

মুহূর্ত মাত্র কেটে গেল। ব্যাংকস্-বোনের সম্মোহিত চোখ দুটি ক্যাম্বিশের প্রতি নিবন্ধ হলো। হঠাৎ দেখা গেল ক্যাম্বিশের ওপরে কুয়াশার মতো কিছু একটা জমা হচ্ছে। দিন-দুপুরে রোদের মাঝে কোত্থেকে এলো এই ধোঁয়াসা? না, বেশিক্ষণ থাকলো না এই ধোঁয়া। হঠাৎই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠলো মানুষের মুখের ছায়া। পর পর আঁকা হয়ে যেতে লাগলো সেই ছায়ার ওপর নাক-কান, চোখ।

কেঁপে উঠলেন বন্ধু দু'জন। চারিদিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন তীক্ষ্মভাবে। না, কেউই আঁকছে না ছবিটি। যেন কোনো অশরীরী শিল্পী তার অদৃশ্য হাতে এঁকে যাচ্ছে, কলকাতায় মৃত পয়সকান্তির ছবি। এক-একবার ক্যাম্বিশ থেকে অদৃশ্য হচ্ছে ছবিটি, পরমুহূর্তে আবার ভেসে উঠছে ক্যাম্বিশের ওপর। এইভাবে তিন-চার বার চললো। যখন সম্পূর্ণ হলো ছবিটি, দেখা গেল, পয়সকান্তির ফোটোর ঠিক অনুরূপ।

আশ্চর্য-বিস্ময়ে দুই বন্ধুর মন থেকে তখন প্রেতাত্মায় অবিশ্বাস কমতে শুরু করেছে। এই অভাবনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে এঁরাই এই ঘটনার কথা লিখে জানান 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন'-এ।

শিশিরকুমার তাঁর 'শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত'-এর ষষ্ঠ খণ্ডটি প্রাণাধিক পুত্র পরলোকগত পয়সকান্তিকে উৎসর্গ করেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন,

'…তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে তোমার একখানি ছবি প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা ছিল, মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়মই আমার সে মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি বিশ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে অন্ততঃ কোনো কারিগর একমাসের মধ্যে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারে না।'

ছবিটি ১৯০৯-এ আঁকা। 'কিন্তু এখনও দেখিলে মনে হইবে যেন ইহা এখনই আঁকা হইয়াছে।'

প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দেহে
ভর করেছিল তাঁদেরই পরলোকগত গোমস্তা
কুরন সরকারের প্রেতাত্মা

হালকা হাসি ও তীক্ষ্ম ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে যিনি যুগজীবনের নিখুঁত বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁর এই 'হিউমার'-বোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল কবিত্বশক্তি—তিনি তো দীনবন্ধু! দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), কি নাট্য রচনায়, কি কবিত্বশক্তিতে তিনি ছিলেন সে-যুগে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। 'নীলদর্পণ নাটক', 'নবীন তপস্বিনী নাটক', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'দ্বাদশ কবিতা', 'সুরধুনী কাব্য' লিখে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পথ সৃষ্টি করে গেছেন।

দীনবন্ধুর জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের কয়েক ক্রোশ পূর্বে চৌবেড়িয়া গ্রাম। মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্কুল-কলেজে খ্যাতি ছিল। হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু কিন্তু প্রথম জীবনে

প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতেন না। সরকারী চাকরি উপলক্ষে বহু জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। পাটনা, আসাম, উড়িষ্যা, ঢাকা, নদীয়া, যশোহর—সর্বত্রই থেকেছেন বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন ঘটনা তাঁর সাহিত্যে তাই স্থায়ীরূপ নিতে পেরেছিল।

মৃত্যুর পরেও কি আত্মা পরজগতে বর্তমান থাকে ?—এই চিন্তা এক সময়ে দীনবন্ধুর মনে এসেছিল। ফলে, তিনিও যশোহরে থাকতে যোগ দিয়েছিলেন প্রেতাত্মাকে মর্তে আনার খেলায়। সঙ্গে ছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার, অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এটা সেদিন দীনবন্ধুর কাছে খেলাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রেত্মাত্মা-আনা-খেলা বেশিদিন 'খেলা' হয়ে থাকেনি তাঁর কাছে।

তিনি নিজের চোখে যে-ঘটনাটি দেখেছিলেন তাঁর গ্রামে, তাতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। রায়বাহাদুর দীনবন্ধু বিশ্বাস করেছিলেন, মরজগতে মানুষ যদি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কলুষিত জীবন যাপন করে, তাহলে পরলোকে গিয়েও সে-আত্মাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আত্মার যে বিনাশ নেই, প্রয়োজন হলে অন্য দেহেও সে আশ্রয় নিতে পারে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পারে—এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছিলেন দীনবন্ধু এই ঘটনা দেখে।

গ্রামের বয়স্ক ব্রাহ্মণ। বিয়ে করেছিলেন এক তরুণীকে। সে-কালে বহু বিবাহের রেওয়াজ ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণকে মেয়ে দিতে পারলে অনেক মেয়ের বাবা উদ্ধার হয়ে যেতেন। তা সে-পাত্র বৃদ্ধই হোক বা যুবাই হোক। অনেক সময়ে দেখা যেত, স্ত্রী পূর্ণ যুবতী হয়ে ওঠার আগেই স্বামী দেহ ত্যাগ করতেন। বয়সের যে বিরাট ব্যবধান হতো স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে—এটাই তার প্রধান কারণ। যৌবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বৈধব্যের কঠিন আবরণে অধিকাংশ স্ত্রীর অন্তরে গুমরে গুমরে কেঁদে মরতো।

কিন্তু এই ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে তার উলটোটা হলো। ব্রাহ্মণের স্ত্রী মারা গেলেন অকালে একটি কন্যাকে রেখে।

কন্যাটি বড় হতে লাগলো। মায়ের অবর্তমানে তার নিঃসঙ্গ জীবন পর পর বড় বেদনাময় হয়ে উঠতে লাগলো। সে শুধুই চিন্তা করতো, মারা গিয়ে মা তার কোথায় আছে, কেমন আছে! যদি একটিবারের মতো মাকে দেখতে পেতো!

তার মা যখন মারা যায় তখন মেয়ের বয়স আট-নয়! বেশ বুঝতে শিখেছে সে, মরা-মা আর কোনো দিন তার কাছে ফিরে আসবে না। এই বয়সেই সে বৃদ্ধ পিতার সেবা-যত্ন করতে শিখেছে। বাবার তামাক-সাজা, জল গড়িয়ে দেওয়া, খাবার পরে পান সেজে বাবার সামনে রেখে যাওয়া—সবই সে করে।

হঠাৎ সে একদিন শুনলো, বাবা আবার বিয়ে করবে। পাত্রীপক্ষ ঘন ঘন তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। মনে পড়লো তার মায়ের শেষ কথা কটি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তার মা তার বাবাকে মিনতি করে বলেছিল, তুমি আর বিয়ে ক'রো না। তাহলে আমার মেয়ে কষ্ট পাবে। সৎমায়ের কাছে ও যন্ত্রণা পাবে। মায়ের দু'চোখ ভ'রে সেদিন জল টলটল করছিল।

এসব ভুলতে পারে না মেয়ে। আরও বয়স বেড়েছে তার। এখন তার বয়স তেরো-চৌদ্দ। বাবা আবার নতুন মা নিয়ে আসবে শুনে মনে তার আতঙ্ক, ভয়। প্রায় রোজই সে পাশের আমবাগানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মৃতা মাকে মনে মনে বলে, মাগো, তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। আমি এখানে বাঁচবো না। আমায় কেউ ভালোবাসে না। বাবাও না।

চোখের জল মুছে রোজই সে ফিরে আসে বাড়ি। মনের ব্যথা মনে লুকিয়ে রেখে আবার ঘরের কাজে লেগে যায়। বাবার সেবা-যত্নেরও ত্রুটি রাখে না।

একদিন বাবা বিয়ে ক'রে তার নতুন-মাকে ঘরে নিয়ে এলেন। বয়সে তার থেকে এক বছরের ছোটো। পাছে নতুন-মা তাকে সহ্য করতে না পারেন, তাই সে নতুন-মায়ের সেবায়ও মনোনিবেশ করলো। পায়ে আলতা পরিয়ে দেওয়া, বিকেলে চুল বেঁধে দেওয়া, রান্নার কাজে নতুন-মাকে সাহায্য করা—সব সময়ে সে তটস্থ হয়ে থাকতো নতুন-মায়ের কাছে।

নতুন-মা কিন্তু বাড়িতে এসেই মেয়েকে ভাবতে শুরু করেছেন— সতীনের মেয়ে, তাঁর চিরশত্রু। ফলে যা হবার হলো। মেয়ের কোনো কাজেই নতুন-মা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। স্বামীকে বলেন, যত তাড়াতাড়ি পারো আপদ বিদেয় করো। বুড়ো-ছোঁড়া যা পাও তার সঙ্গে সাত পাকে ঘুরিয়ে দাও।

বাবা মাথা নাড়েন।

সেদিন ছিল শনিবার। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় মিশেছে। আলো-ছায়ার খেলা আমবাগানে। নতুন-মায়ের চুল বাঁধতে বসেছে মেয়ে। যে-কাজ রোজই বিকেল বেলায় সারা হয়, তা আজ ভর সন্ধেতে শুরু হলো। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসেছেন এলো-চুলে নতুন-মা। পেছনে বসে মেয়ে চিরুনি চালিয়েছে তার নতুন-মায়ের একরাশ খোলা চুলে।

হঠাৎ একি হলো মেয়ের ! হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেই চিৎকার শুরু করলো, সতীন খাবো সতীন খাবো ! বলেই তার নতুন-মায়ের গালে সজোরে এক কামড়। এমনভাবে দাঁত বসিয়েছে যে নতুন-মা ছটফট করতে লাগলো।

মেয়ের চিৎকার শুনে ছুটে এলেন বাবা। দেখলেন দংশন যন্ত্রণায় তাঁর নতুন বৌ ছটফট করছে।

বাবাকে দেখেই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মেয়ে ছুটে গেল বাবার দিকে। অশ্রাব্য ভাষায় সে তার বাবাকে গালি দিচ্ছে। চোখ দুটো তার জবাফুলের মতো লাল। অঙ্গে কাপড়চোপড়ও নেই। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে। বাবার দিকে তাকিয়ে বলছে কখনো—বারণ করেছিলাম বিয়ে করতে। আমার মেয়েকে কষ্ট দিয়ে তোমরা সুখী হবে ? কক্‌খনো তা হতে দেবো না। তোমার বৌকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো। সতীনের জ্বালা আমি জুড়োবো।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক এলো ছুটে। মেয়ের এই রূপ দেখে সবাই স্তম্ভিত। আতঙ্ক-ভয়ে অনেক মেয়েরাই কাছে এলো না। ভয়, যদি তাদের ওপরেও প্রেতাত্মা ভর করে !

কোনো লোকই মেয়ের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। সে যেন অসীম

শক্তির অধিকারিণী। ধপ্-ধপ্ করে পা ফেলে হাঁটছে। পরনে একটা সায়া আর ব্লাউজ। চোখ দিয়ে যেন সবকিছু গিলে ফেলতে চাইছে।

এ কী হলো!—বাবা সবাইকে মিনতি করলেন, এর একটা বিহিত করো তোমরা। মেয়েটা আমার মারা যাবে।

কেউ-কেউ ছুটলো ডাক্তারের খোঁজে, কেউ ভূত-ঝাড়ানো ওঝাকে ডাকতে। মৃত মায়ের আত্মা ভর করেছে একমাত্র আদরের কন্যার শরীরে।

এ-ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন দীনবন্ধু। শিশিরকুমারকে এ-ঘটনা জানিয়েছিলেন। শিশিরকুমারও যখন প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলায় কৃতকার্য হলেন তখন তিনি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ও তাঁর কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কিশোরীলাল সরকারকে জানালেন। ওঁরা বললেন, সব-কিছু সাধারণকে জানান। শিশিরকুমার সঙ্গে সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এ লিখে পাঠালেন। সারা দেশে হুলস্থুল পড়ে গেল।

দীনবন্ধু নিজেই একবার এই চক্রে মিডিয়ম হয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন শিশিরকুমার ও সঙ্গীসাথীরা।

টেবিল ঘিরে বসেছেন সবাই। হঠাৎ দীনবন্ধুর দেহে প্রেতাত্মা ভর করলো। তিনি অচৈতন্য অবস্থায় টেবিলের ওপর কয়েকটা ঘা দিলেন বন্ধ মুষ্টি দিয়ে।

সঞ্জীববাবু বললেন, চালাকি করছেন দীনবন্ধুবাবু।

শিশিরকুমার চোখ পাকালেন সঞ্জীববাবুর দিকে। ইসারা করলেন, চুপ!

শিশিরবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ দীনবন্ধুর সামনে দিয়ে পেনসিলটা গুঁজে দিলেন হাতে। তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে এলেন?

দীনবন্ধু সেই মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় পেনসিল দিয়ে লিখলেন—কুরন সরকার। উপস্থিত কেউ-ই এই নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। তাই আবার অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাবেন শিশিরকুমার, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হারালেন দীনবন্ধু। ঢলে পড়লেন টেবিলের ওপর মাথা রেখে।

সবাই নির্বাক্। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাড়াতাড়ি জল ছিটিয়ে দিলেন দীনবন্ধুর চোখে-মুখে।

চৈতন্য ফিরে পেলেন দীনবন্ধু। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো তাঁর—আমি কোথায়?

তারপরেই চোখ পড়লো কাগজের দিকে।

সবাই বললেন, কে এই করুন সরকার?

দীনবন্ধু বললেন, এঁকে আপনারা চিনবেন না। করুন সরকার আমাদের গোমস্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এঁদের আরেকটি প্লানচেটের আসরে প্রেতাত্মা ভর করেছিল সাবজজ গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেহে। সেদিনের ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন এঁরা সবাই।

প্রেতাত্মা ঘরে আসতেই গিরিশচন্দ্র কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে দেওয়া হলো পেনসিল ও সামনে কয়েকটি সাদা কাগজ।

গিরিশচন্দ্র পেনসিল দিয়ে প্রথমে কাগজের ওপর কয়েকটা হিজিবিজি দাগ টানলেন। নষ্ট হলো কাগজটা। সরিয়ে নেওয়া হলো নষ্ট-কাগজ। এই ভাবে নষ্ট হলো পর পর কয়েকটা কাগজ। তারপরেই নাম লেখা হলো মহাকবি মিলটনের।

সবাই বিস্মিত। কবি মিলটনের প্রেতাত্মা!

একজন বললেন, সত্যি যদি আপনি কবি মিলটন হন, তাহলে একটা ল্যাটিন কবিতা লিখে দিন।

বহুক্ষণ চেষ্টা করলেন মিডিয়ম গিরিশচন্দ্র। সবাই বিপুল স্থৈর্য নিয়ে কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কবিতা আর লেখা হলো না। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে চললো কবিতা লেখার চেষ্টা। অবশেষে ফল ফললো। কাগজের ওপর লেখা হলো ল্যাটিন ভাষায় একটি কবিতা।

কিন্তু পড়বেন কি করে এঁরা? গিরিশবাবুও ল্যাটিন জানেন না, উপস্থিত কেউই এ-ভাষা জানেন না। বোঝেনও না। গিরিশবাবুর চালাকি কিনা তাও এঁরা বুঝতে পারছেন না।

ঠিক হলো, তৎকালীন বিভাগীয় স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর মিস্টার ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করে লেখাটি দেখাবেন। ক্লার্ক অনেক ভাষাতেই সুপণ্ডিত। তিনি তখন যশোহর স্কুল পরিদর্শনে সময় কাটাচ্ছেন।

সবাই গিয়ে উপস্থিত হলেন ক্লার্কের বাংলোয়। ক্লার্ক লেখা পড়ে বললেন, হ্যাঁ, এটা একটি ল্যাটিন কবিতা। তবে অনেক ভুল আছে লেখার মধ্যে। তাছাড়া কবিতাটি অসমাপ্ত।

তারপর প্লানচেটের সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন, আপনারা সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছেন।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহনের

মামলা নিষ্পত্তি করলো প্রেতাত্মা

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৪৬) রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রের পিতা। সৌরীনবাবুও পরলোক-চর্চা করতেন। মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলতেন। ভূত নামাতেন তাঁর 'টেবল-টার্নিং' প্রক্রিয়ায় আর প্লানচেটের মাধ্যমে। অনেক সময় নিজেও ভুতের মুখোমুখি হয়েছেন।

এই 'টেবল-টার্নিং' ব্যাপারটা কি? প্লানচেটই বা কীভাবে করতেন তিনি?

সৌরীনবাবুর মুখ থেকেই শোনা যাক সে-কথা। 'টেবল-টার্নিং' প্রক্রিয়ায় প্রথমে প্রয়োজন একখানি তেপায়া গোল টেবিল। টেবিলের গোল তক্তার মোটা ডাণ্ডার তলদেশ থেকে তিনটি ছোট পায়া বা tand বেরুনো থাকবে। এই টেবিল ঘিরে তিনখানি চেয়ারে তিনজনে বসবেন—বসে তাঁরা দু'হাতের দশটি আঙুল প্রসারিত করে আঙুলের গাগুলি দিয়ে খুব আলতো ভাবে টেবিলটি স্পর্শ করে থাকবেন—তনজনের সংযোগ থাকবে ঐ আঙুলে—অর্থাৎ রাম শ্যাম যদু তিনজন বসবেন টেবিল ঘিরে; রাম বসবেন তাঁর দু'হাতের দশটি আঙুল প্রসারিত করে—শুধু আঙুলের ডগা আলতো ভাবে স্পর্শ করে থাকবে

টেবিল—তার ডানদিকে বসেছেন শ্যাম—শ্যামের বাঁ হাতের কোড়ে আঙুল ঠেকে থাকবে রামের ডান হাতের কোড়ে আঙুলের সঙ্গে। আবার শ্যামের ডানহাতের কোড়ে আঙুলের ছোঁয়া থাকবে যদুর বাঁ হাতের কোড়ে আঙুলের সঙ্গে। টেবিলের উপর আঙুল থাকবে খুব আলতো ভাবে। শুধু ছুঁয়ে থাকা। টেবিলে আঙুলের এতটুকু চাপ পড়বে না।

তিনজনে এমনি ভাবে বসে চোখ বুজবেন। চোখ বুজে একান্ত নিবিষ্ট মনে তিনজনের বিশেষ জানা কোন মৃত ব্যক্তির চেহারা স্মরণ করবেন। ধ্যানের মতো স্মরণ করা—মনে তখন অন্য কোনো বা কারো চিন্তা নয়।

ঘর নিস্তব্ধ থাকবে। নিস্তব্ধ ঘরে বিশ-পঁচিশজন লোক বসেন যদি, ক্ষতি নেই। তবে কেউ কথা কইবেন না বা এতটুকু শব্দ করবেন না। এমনি ভাবে মৃতের ধ্যানে বসে মৃতের চেহারা মনে করে তাঁকে স্মরণ করা। মনে মনে প্রার্থনা জানাতে পারেন—আপনি আসুন।

পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে প্রশ্ন করবেন—আপনি যদি এসে থাকেন, তাহলে টেবিলের দক্ষিণ দিক্‌কার পায়াটি তুলে দুবার মেঝেয় ঠুকুন।

আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, এ-কথার পর টেবিলের সে-পায়া উঠলো—উঠে ঠুক্ করে ঠুকলো মেঝেয়। অনেক সময় এমন হয়, টেবিলের পায়া উঠলো না! তখন নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া নয়—যাঁকে স্মরণ করছেন, তাঁকে স্মরণ করতে থাকুন (continue)। (ঐ যে কথা বলা—তিনজনের মধ্যে একজন শুধু এমন কথা কইবেন। কথা কইবার জন্য একজনকে বেছে নেওয়া ভালো—তারপর অবশ্য বাকি দু'জনও কথা কইতে পারেন—তবে এক-একজন করে কথা কইবেন—একসঙ্গে দুজনে কথা বলবেন না বা এ-সময়ে কোনে কলরব-কোলাহল করবেন না)।'

এই টার্নিং টেবিলের সাইজ হবে উঁচুতে সাতাশ থেকে তিরিশ ইঞ্চি আর ব্যাস হবে বিশ-বাইশ ইঞ্চি। টেবিলকে ঘিরে যে তিনখানা চেয়ার থাকবে তা যেন চেয়ারে চেয়ারে গা-ঘেঁষে না থাকে। অর্থাৎ কারো দেহ ছুঁয়ে না থাকে।

একাজে প্রথমেই দরকার তন্ময়তা। ইহলোক ছাড়াও যে বাইরে

কিছু আছে তার প্রমাণ দেশ-বিদেশের সব মনীষীই স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন অনেক কিছু। যাকে চিন্তা করবেন আপনার তন্ময়তার জোরে সে আসবেই আপনার টার্নিং টেবিলে। হোক না কেন সে বহুকাল আগে মৃত্যু বরণ করেছে। তাকে আমরা আত্মাই বলি আর স্পিরিট-ই বলি না কেন—বলি আসবেই আপনার আসরে। ভর করবে আপনার টেবিলে।'

সৌরীন্দ্রমোহন বহুবার, অনেক বছর ধ'রে টেবিল-টার্নিংয়ের মাধ্যমে অনেক মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন, মৃত আত্মার কথাবার্তা যাচাইও করে নিয়েছেন সব সময়—সত্য বলে প্রমানিতও হয়েছে সে-সব কথাবার্তা। ছোটবেলা থেকেই তাই বোধ করি টেবিলে ভুত-নামানোর প্রবল নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

একবার তো মিনার্ভা থিয়েটার ভার্সেস কোহিনূর থিয়েটারের কেস নিয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হলো সৌরীন্দ্রমোহনের অফিসে। মিনার্ভার মালিক মনোমোহন পাঁড়ে হাইকোর্টে নালিশ করলেন তখনকার দিনের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুশীলাবালার নামে। ইনজাংশান দিলেন যাতে সুশীলাবালা 'কোহিনূর' থিয়েটারে না যেতে পারে। কোহিনূরের মালিক পাটের ব্যবসায়ী শরৎকুমার রায়ও নাছোড়বান্দা। তিনি মিনার্ভার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি মিনার্ভা থিয়েটার থেকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে গেছেন গিরিশচন্দ্রকে, দানিবাবুকে, তিনকড়ি দাসীকে এবং আরো অনেককে। বাকি আছে সুশীলাবালা। তাকে ভাঙিয়ে কোহিনূরে নিয়ে যেতে চান শরৎকুমার। কিন্তু বাদ সাধলেন মিনার্ভার মালিক মনোমোহন পাঁড়ে। কেস করে দিলেন হাইকোর্টে।

মনোমোহনের তরফের অ্যাটর্নি ম্যানুয়েল আগরওয়ালা আর সুশীলাবালার তরফের অ্যাটর্নি কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরীন্দ্র মোহন এঁর কাছেই আর্টিকেল ক্লার্ক। দু' পক্ষের কেস বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় কুমুদনাথ একদিন সৌরীন্দ্রমোহনকে বললেন টেবিল-টার্নিং করে কেসের ভবিষ্যৎ জানতে।

বসে গেলেন সৌরীন্দ্রমোহন টেবিলে প্রেতাত্মাকে আনতে।

টেবিলে বসলেন তিনজন। সৌরীন্দ্রমোহনের আবাল্য সুহৃদ ও সহপাঠী অচল মিত্র, 'বস' কুমুদনাথ এবং সৌরীন্দ্রমোহন নিজে।

'অফিসে বহু ভদ্রলোক জমায়েৎ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিল জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র (অমর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র—হাইকোর্টে তখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার, কুমুদবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু এবং প্রত্যহ অফিসের পর তিনি আসতেন কুমুদবাবুর অফিসে এবং কুমুদ-বাবুর গাড়িতে তিনি বাড়ি ফিরতেন), ব্যারিস্টার এন, চ্যাটার্জী, স্যর আবদার রহিমের ক্লার্ক প্রবোধ বসু (রহিম সাহেব তখনো ব্যারিস্টারী করছেন হাইকোর্টে—পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হ'য়ে মাদ্রাজ যান, আরও পরে স্যর উপাধিতে ভূষিত হন)···ব্যারিস্টারের ক্লার্কগিরি করলেও প্রবোধবাবু তখন বাংলা থিয়েটারে ছোট-খাটো ভূমিকায় অভিনয় করতেন, পরে ম্যাডানের বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিতে এবং শিশির-কুমারের নাট্যমঞ্চে অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।···

অচল, আমি এবং কুমুদবাবু টেবিলে বসলুম তিনজনে। স্মরণ করতে লাগলুম স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রকে। অর্থাৎ আইন-আদালতের ব্যাপার, এ-ব্যাপারে তাঁর স্পিরিটই হবেন যোগ্য ব্যক্তি আমাদের প্রশ্নের জবাবের জন্য।

অফিস-কামরা নিস্তব্ধ। বেয়ারা-পিয়নগুলো পর্যন্ত কাঠের পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তারা শুনেছে, বাবুরা ভূত নামাবেন টেবিলে—ভয় পেলেও এত লোকের ভিড়ে ভরসা হারায়নি তারা। ভাবছে, না জানি, কি দেখবে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, না, আগুনের ঝলক! আর সকলে বসে আছেন, মনে অদম্য কৌতূহল। কৌতুক উপভোগের বাসনাও তাঁদের ছিল না, এমন নয়।

আমরা তিনজনে চোখবুজে স্যর রমেশচন্দ্রের ধ্যান করছি—প্রায় দশ মিনিট পরে আমি প্রশ্ন করলুম, স্যর রমেশচন্দ্র যদি দয়া করে এসে থাকেন তো অমুক দিক্‌কার টেবিলের পায়া তুলে একবার ঠুকুন।

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের সেই পায়া উঠলো একটু উঁচু হয়ে—উঁচু হয়ে তখনি মাটিতে নামলো—ঠুক্‌ করে শব্দ—একবার।

সকলে বুঝলুম, তিনি এসেছেন। তখন প্রথমে এটা-ওটা নানারকম প্রশ্ন। তার মধ্যে জ্যোতিষবাবু বললেন—জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর তিন ছেলের মধ্যে কোন্‌ জনের উপর তাঁর বেশি শ্রদ্ধা-ভালবাসা? বড় মন্মথনাথ হলে একবার মাত্র পায়া ঠোকা, প্রভাসচন্দ্র হলে দুবার, বিনোদ-

চন্দ্র (Sir B. C, Mitter) হলে তিনবার পায়া ঠোকা। এ প্রশ্নের জবাবে তিনবার পায়া ঠুকলো। আমরা বুঝলুম, বিনোদচন্দ্রের কথা বললেন।

হাইকোর্টের ব্যাপারে জ্যোতিষবাবুর নির্দেশে আরো দু-চারটি কথার পর কুমুদবাবুর প্রশ্ন—মিনার্ভা থিয়েটারের মামলায় মিনার্ভা জিতবে, না, সুশীলাবালা? টেবিলের পায়া ঠোকার সংকেতে জবাব পেলুম মিনার্ভা থিয়েটার। আবার প্রশ্ন করা হলো—কোহিনুরে সুশীলাবালার যোগ দেবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

পায়া ঠোকার জবাব মিললো—না।

আশ্চর্য! কয়েকমাস পরেই হাইকোর্টের রায় বেরুলো মিনার্ভার পক্ষে এবং সুশীলাবালা কোহিনুরে যেতে পারবেন না—যতদিন না তাঁর মিনার্ভার সঙ্গে কনট্রাক্ট শেষ হয়।

সবাই অবাক্-হয়ে গেলেন টেবিল-টার্নিং-এর ক্ষমতা দেখে। বিস্মিত হলেন অলৌকিক শক্তির যাথার্থ্য বিচারে। এই টেবিলে বসে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন তো বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মাকে টেনে তাঁদের মুখ থেকে অনেক অজ্ঞাত তথ্য জেনেছেন দিনের পর দিন।

শুধু এটাই কেন, সৌরীনবাবু তাঁর প্রায়-খোয়া-যাওয়া জমি উদ্ধার করেছিলেন কীভাবে? তাও তো প্ল্যানচেটের মাধ্যমে 'স্পিরিট'কে আনিয়ে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯১০ সালে।

প্রায় সাতপুরুষ ধরে কলকাতার দক্ষিণে শাহপুর অঞ্চলে সৌরীন-বাবুরা কিছু জমিজমার স্বত্ব ভোগ করছিলেন। এটা তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি। এমন সময় পোর্ট কমিশনার্স থেকে ঐ অঞ্চলের জমি অ্যাকুইজিশন শুরু হলো। কারণ খিদিরপুর ডক আরও প্রসারিত হবে।

প্রবীণ আই. সি. এস. ডুভাল সাহেব তখন ল্যান্ড-অ্যাকুইজিশনের কালেকটর। কিন্তু গোল বাধলো কলকাতার এক ধনী ব্যক্তিকে নিয়ে। তিনি বললেন, শাহপুরের জমির মালিক আমি। ক্ষতিপূরণ আমাকেই দিতে হবে। প্রবল প্রতাপশালী ঐ ধনী ব্যক্তিটি। টাকার জোরও কম নয়।

সৌরীনবাবু কিন্তু দমলেন না। বললেন, মামার বাড়ি নাকি? আমাদের জমি অন্য লোক আত্মসাৎ করে দেবে? আলিপুর জজ কোর্টে চললো মামলা। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার প্রধান হাতিয়ারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে তো হাজির হতে হবে কোর্টে। সৌরীন বাবুর কাছে কাগুজে প্রমাণ বলতে আছে দশ-পনেরো বছরের খাজনার কাউন্টার পার্ট। আর সাক্ষী আছে রায়ত বেণীমাধব দাস।

ওদিকে ধনী ব্যক্তিটি এত দলিল-দস্তাবেজ কোর্টে দাখিল করেছেন যে জিৎ ওঁর নিশ্চিত। কিন্তু সৌরীনবাবুদের জমির খাজনার দাখিলার চেকমুড়ি তো তিনি জমা দিতে পারেন নি কোর্টে। আশ-পাশের সবই তো তাঁর জমি। কিন্তু ঐ জমিটুকুর দলিল কোথায়? ধনী ব্যক্তির উকিল সরকারী প্লীডার দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ তো বলেই ফেললেন, ঐ এলাকার সব জমিই যদি আমার মক্কেলের হয়, তাহলে মাত্র ঐটুকু জমির মালিক সৌরীনবাবুরা কি করে হবেন?

সৌরীনবাবুর উকিল রামরতন চট্টোপাধ্যায় রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। সত্যিই তো তাঁর মক্কেলের কাছে তো জমিকেনার দলিলটি নেই। তিনি বললেন, আশপাশের এত জমি ওঁর, দলিলও আছে তার, শুধু মাঝখানের জমিটুকুর দলিলও তাঁর নেই। আমরাও তো দলিল দাখিল করতে পারছিনে। কী হবে বলা যায় না। এখন হাকিমের মর্জি।

দেড় বছর ধরে মামলা চলছে। দুর্ভাবনার শেষ নেই সৌরীনবাবুর। খেশারতের টাকা বোধ হয় পাওয়াই যাবে না। সৌরীনবাবুর ভাষায়ঃ 'হঠাৎ কি খেয়াল হলো, প্লাঞ্চেটে আমার এক পূর্বপুরুষের আত্মাকে আনানো হলো একদিন এবং এটা-সেটা নানা প্রশ্ন করার পর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম, উপায় মেলে যদি। প্লাঞ্চেটে জবাব পেলুম—কালেকটরির চিঠায় পাবে। এক পূর্বপুরুষের নাম পাবে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় - তাঁর আর একটি নাম ছিল গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদ আর কেদারনাথ একই ব্যক্তি। জমির ও বাড়ির অন্য দলিল গোরাচাঁদের নামে—শুধু ঐ জমি 'কেদার নাথ' নামে কালেকটরির চিঠায় চিহ্নিত। এবং প্লাঞ্চেটে তিনি অন্য এক সম্পত্তির উল্লেখ করলেন। লিখলেন – সে দলিল খুলে দেখবে, গোরাচাঁদ ওরফে কেদারনাথ—এবং এই সূত্র ধরে কালেকটরি থেকে কেদারনাথের নামে

চিহ্নিত জমির চিঠার পাকা নকল (certified copy) দাখিল করলেই স্বত্বপ্রমাণে বাধা থাকবে না।

আশ্চর্য! কালেকটারির চিঠা সার্চ আমি নিজে করেছিলুম। কিন্তু পূর্বপুরুষদের যে নাম আমার জানা ছিল—তার কোনো নাম পাইনি চিঠায়। এ জমির দাগ-নম্বরের মালিকের নাম পেয়েছিলুম—প্লাণ্ডেটের নির্দেশে কেদারনাথ। ঐ নামের চিঠার পাকা নকল নিয়ে আদালতে দাখিল করলুম এবং ঐ নামের প্রমাণস্বরূপ অপর সম্পত্তির যে-দলিলে গোরাচাঁদ ওরফে কেদারনাথ নাম লেখা—সেই দলিলও সেই সঙ্গে দাখিল করলুম। আমাদের দাবি জোর হলো—তখন মামলার আপোষ হলো। অপর পক্ষ এ দলিল দেখে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করলেন এবং আমরা পেলুম খেশারতীর টাকা।

খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহের আকর্ষণেই রোজ দেখা দিত

রোজার প্রেতাত্মা

নিউওয়ার্কের কিছুটা দূরে এই গ্রাম। নাম হাইড্স্‌ভিল (Hydesville)। ডক্টর হাইড নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই গ্রামটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামেই এই গ্রামের নাম। গ্রামের চারিদিক ঘিরে রয়েছে শস্যশ্যামল সবুজ বর্ণের সমারোহ। ডক্টর হাইডের কাঠের মনোরম বাড়িটি ঠিক গ্রামের মাঝখানে। দোতলা বাড়ি। ওপরের তলাটি উঁচু মঞ্চের মতো। নানা রকম জিনিসপত্র রাখার জন্যে। ওটা ব্যবহার করা হতো না। প্রকৃত বাসঘর বলতে একতলাটি। একতলায় তিনটি ঘর। একটা খাবার ঘর, দুটি শোবার। শোবার ঘরের পাশেই একটা ছোট্ট ঘর। এ-ঘরের দক্ষিণ কোণে। সেটা ভাঁড়ার। ভাঁড়ার ঘরটি মাটির নিচে থেকে তৈরি করা।

এটা ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগের ঘটনা।

ডক্টর হাইড মারা গেছেন। ওঁর একমাত্র পুত্র বাড়িটি জন ডি, ফক্স নামে এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়ে দিলেন। না। হাইডের মৃত্যুর পর এ- বাড়িতে মিস্টার ফক্সই প্রথম ভাড়াটে নন। এর আগে প্রথম যিনি

ভাড়াটে হিসেবে এ-বাড়িতে আসেন তিনি সস্ত্রীক জন সি, বেল। আর এঁদের সঙ্গেই ঝিয়ের কাজকর্ম ও মিসেস বেলকে দেখাশোনা করার জন্যে ছিল এক তরুণী। নাম লুক্রেশিয়া। এঁরা কিছুদিন বাস করার পর এ-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে বাস শুরু করেন।

বেল-পরিবারের পরেই হাইড্স্ভিলের এই বাড়িতে এলেন ফক্স-পরিবার। এঁরা আগে ছিলেন চেস্টারে। শিক্ষিত পরিবার। পেশায় কৃষিজীবী। কৃষিজীবী হলেও জন ফক্স মান্যগণ্য লোকের মধ্যে বেশ স্থান করে নিয়েছিলেন।

জন ফক্সের সাতটি সন্তান। ছেলেই বড়। সে থাকে অন্য গ্রামে পৃথক হয়ে। ছ'টি কন্যা। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সবার ছোটটি মারা যায় সাত বছর বয়সে। বাবা-মায়ের সঙ্গে বর্তমানে থাকে মেজো মেয়ে মার্গারেটা, বয়স বারো এবং তারপরেরটি। নাম কেথী তার বয়স সাত-আট। অন্য দু'বোন দাদার সঙ্গে। দূরে—অন্য গ্রামে।

এঁদের নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসতে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বালিকা কেথী ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই ছাদের ওপরে কার যেন ধপ্ ধপ্ করে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে ছাদের ওপরে। বিকেল বেলা। কাঠের বাড়ি। শব্দটা বেশ জোরেই হচ্ছে। তবে কি ছাদে কেউ উঠলো নাকি? দিদি বা মা? না। তা কি করে হবে? ছাদে ওঠার তো কোনো সিঁড়িই এ-বাড়িতে নেই। গা-টা ছমছম করতে লাগলো কেথীর। তাড়াতাড়ি নিচে একতলায় নেমে এসেই মাকে বললো শব্দের কথা। মা বললেন, কাঠের ছাদ। শব্দ হতেই পারে। অত ভয়ের কি আছে?

রাত্রে একতলার একটি ঘরে থকেন মা-বাবা, অন্য ঘরে কেথী ও মার্গারেটা। ডিসেম্বরের শীত। রাত্রে শোবার সময় দু'বোন মোটা লেপের তলায় ঢুকেও বেশ কাঁপতে থাকে। একই খাটে পাশাপাশি শোয় ওরা।

সেদিন রাত্রে ওরা শুয়ে পড়েছে লেপমুড়ি দিয়ে। তন্দ্রাও এসেছে ওদের। হঠাৎ কেথী অনুভব করলো কে-যেন ওদের গা থেকে লেপটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছে। কেথী প্রথমে ভাবলো দিদি বোধ হয় ঘুম-

চোখে লেপটা ওর গা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। অন্ধকার রাত। ঘুম-চোখেই কেথী দিদি মার্গারেটাকে বললে, কী হচ্ছে? লেপ টানছিস্ কেন?

কেথীর আওয়াজে মার্গারেটার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি লেপ টানবো কেন? এ তো পায়ের দিক্ থেকেই কে যেন টেনে নিয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলো কেথী। হ্যাঁ ঠিকই তো! ঠিকই তো! লেপটা পায়ের দিকেই খাটের নিচে পড়ে আছে।

ভয়ে হিম হয়ে গেল কেথী। দিদিকে জড়িয়ে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, দিদি— ভূত! বলার সঙ্গে সঙ্গে কার যেন ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া অনুভব করলো তার মুখের ওপরে।

কে?—চীৎকার করে উঠলো কেথী। দিদি, ওঠ্, আমার মুখের ওপর কে-যেন হাত বুলিয়ে দিল।

কেথীর চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে বাতি জেবলে এ ঘরে এলেন কেথীর বাবা আর মা। কী হয়েছে রে কেথী?

ঠক্ ঠক্ করে তখনও কাঁপছে কেথী তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে। মা ঘরে আসতেই কেথী বিছানা থেকে এক লাফে নিচে নেমে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না।—আমি আর এঘরে শোব না। আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।

মার্গারেটার কাছে সব শুনলেন বাবা-মা। সে-রাতটা প্রায় অনিদ্রায় কেটে গেল সবারই।

বাবা বললেন, তোর মনের ভুল এসব। কিভাবে পায়ের চাপে লেপটা পড়ে গেছে। আর শীতকাল, লেপ থেকে মুখ খুলতেই তোর মনে হয়েছে মুখে কে-যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কিছুতেই বাবা বিশ্বাস করলেন না কেথীর কথা। কিন্তু মা? মায়ের মন! মেয়ের কথাগুলো একেবারেই উড়িয়ে দিতে সাহস হলো না তাঁর। হয়তো বা কিছু-একটা ঘটেছে—এ বিশ্বাস মায়ের মনে দোলা দিতে লাগলো।

দিন দুই চুপচাপ গেল।

সেদিন রাত্রে দুই মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছেন বাবা-মা। টেবিলে খাবার আনা হয়েছে। কেথী হাত ধুতে গেছে বাথরুমে। ওঁরা তিনজনে

বসে আছেন চেয়ারে খাবার নিয়ে। কেথী এসে চেয়ারে বসতেই কে যেন চেয়ারটা সরিয়ে নিলো টেবিলের সামনে থেকে। ধপাস্ করে মেঝেতে বসে পড়লো কেথী। কি হলো—কি হলো—বলে মার্গারেটা চেয়ার ছেড়ে উঠে কেথীকে ধরে তুললো।

ভয়ে কাঁপছে কেথী।—কে যেন সরিয়ে দিল আমার চেয়ারটা!—ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কেথীর। মা-বাবাও দেখলেন ঘটনাটি তাঁদের চোখের ওপর।

মার্গারেটার পায়ে লেগে চেয়ারটা সরে যায়নি তো? —বাবার প্রশ্ন।

না। আমি তো পা নাড়াইনি!—মার্গারেটাও কেমন যেন আড়ষ্ট।

চিন্তার রেখা দেখা দিলো বাবার কপালে। —ঠিক আছে, খেয়ে নাও এখন।

মা সবার থালায় খাবার তুলে দিলেন। সবার পৃথক্ বাটিতে দিলেন ডিমের কারি। যেই কেথী ডিমের কারির বাটিটার দিকে হাত বাড়িয়েছে অমনি বাটিটা গেল সরে। আবার যেই ধরতে যাবে কেথী সঙ্গে সঙ্গে বাটিটা বাতাসে ভেসে গিয়ে ঘরের দক্ষিণ দিকের কোণটায় ঠক্ করে পড়লো উলটে।

সবার চক্ষুস্থির। এ অপদেবতা না হয়ে যায় না। ভৌতিক কাণ্ড! এটা ভূতুড়ে বাড়ি নাকি? কই বাড়িওয়ালা তো এসব কিছু আগে বলেনি! সে রাত্রে কারোর খাওয়া হলো না।

সবাই ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে যে-যার বিছানায় গেল। শুয়ে শুয়ে চিন্তার বন্যা বয়ে যেতে লাগলো মিস্টার ফক্সের মাথায়। কেবলমাত্র কেথীর ওপর এ অত্যাচার কেন? বাড়িতে তো আরও তিনটি প্রাণী আছে? তাদের কিছু হচ্ছে না কেন? ···এই ভূতুড়ে বাড়ি ছেড়ে দেবেন? অন্য কোথাও চলে যাবেন? ···কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করে রচেস্টার-এর পাঠ চুকিয়ে এখানে তিনি চলে এসেছেন চাষ-বাস করার সুবিধে আছে বলে। এখন বাড়ি বললেই কি বাড়ি পাওয়া যাবে? মনে মনে সংকল্প করলেন তিনি, দেখি শেষ পর্যন্ত। তারপর এ-বাড়ি ছাড়ার কথা ভাবা যাবে।

একদিন মিসেস ফক্স কেঁদে বললেন, ওগো, মেয়ে দুটোকে বাঁচাও।

ওরা আর এক দণ্ডও এই বাড়িতে থাকতে চাইছে না। ভয়ে ভয়ে কেথী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

কেথীকে ডাকলেন বাবা। বললেন, আমার অবস্থা তো তোরা জানিস। হাতে টাকাকড়ি যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। আমাকে একটু টাকার সংস্থান করতে দে, তারপর চলে যাবো এ-বাড়ি ছেড়ে।

সেই থেকে কেথী, ছোট্ট কেথী, বুকে সাহস নিয়ে সবকিছুই সহ্য করতে লাগলো। কিন্তু জানুয়ারী মাস থেকে যেন ভূতের উপদ্রবটা বাড়তে থাকলো। কেথী দুপুরে যে-খাটে শুয়ে থাকে. হঠাৎ সে অনুভব করে কে-যেন অদৃশ্য হাতে খাটটি উপরে তুলে নিয়ে আবার মাটিতে ছেড়ে দেয়। যে-চেয়ারে বসে সে, সে-চেয়ারটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। নির্ভয়ে সব সহ্য করে কেথী। সবই তো অদৃশ্য, কাকেও সে দেখতে পায় না।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছে দু'বোন। প্রদীপের বাতি ঘরের এককোণে জ্বলছিল। হঠাৎ কেথীর পায়ে ঠেকলো একটা লোমশ কুকুরের দেহ। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই কুকুরটি একলাফে ঘরের সেই দক্ষিণ কোণ-টাতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। —দিদি, কুকুর ! মার্গারেটা উঠে বসতেই সব ফাঁকা। বললো—কোন্ কোনে ?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেথী—ঘরের যে-কোণে তার ডিমের বাটিটা গিয়ে আছড়ে পড়েছিল কয়েক দিন আগে। ঠিক সেই কোণটা।

সকালে উঠেই মাকে বললো কেথী—মা, ঘরের একটি কোণেই সব ব্যাপারগুলো ঘটছে। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

মা বললেন, ঐ দিকে তো আর কিছুই দেখতে পারছি না, ওর নীচে তো আমাদের ভাঁড়ার ঘর, যেটা মাটির তলা থেকে গেঁথে তোলা। —মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না ! তাছাড়া মাঠের মধ্যে আমাদের বাড়ি। লোকজনের বসবাস, তাও তো দূরে। কীসে যে কি হয় আমারও মাথায় আসছে না।

কয়েকদিন এমনিভাবে চলার পর প্রেতের উপদ্রব অন্য মূর্তি ধারণ করলো। ঘরের টেবিল, সোফা, চেয়ার সব নাচানাচি শুরু করলো।

চেয়ারখানি যে-স্থানে ছিল পরমুহূর্তে দেখা গেল সেখানি অন্য জায়গায় ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে চলে গেল। ভারী সোফাটি ধীরে ধীরে সরতে সরতে ঘরের এক কোণে গিয়ে থেমে গেল।

স্বামী-স্ত্রী কারো চোখে ঘুম নেই, পেটে নেই খিদে। মেয়ে দুটোর হালও একই। একটা আতঙ্ক ও অশান্তির ছায়া দিনেরাত ফক্স-পরিবারকে ঘিরে রয়েছে!

১৮৪৮-এর ৩১ মার্চ। শুক্রবার। বেলা থাকতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে ঘুমোবার জন্য ফক্স একটি ঘরে শয্যা নিলেন। অন্য ঘরে পৃথক্ পৃথক্ খাটে শুলেন ফক্স-গৃহিণী, মার্গারেটা ও কেথী। ঘুম আর আসে না কারোর। হঠাৎ কেথী চিৎকার করে বলে উঠলো, এই তো মা, আবার এসেছে। এই দেখ, আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছে। সেই ঠাণ্ডা হাত!

মা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। জ্বলন্ত প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় মা কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ কেথীর মাথা থেকে হাতের স্পর্শ বন্ধ হয়ে গেল।

কেথী মরিয়া হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে, তুমি যেই হও, আমার সামনে এসে দেখা দাও। যদি দেখা দিতে না পারো, আমি যেমন তুড়ি দিয়ে শব্দ করছি তেমনি শব্দে জানিয়ে দাও তুমি এই ঘরেই আছো। —বলে সে একবার তুড়ি মেরে শব্দ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সেই কোণ থেকে একটি তুড়ির শব্দ হলো।

কেথী সাহস সঞ্চয় করে আবার দুটি তুড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে কোণ থেকে দুবার তুড়ির শব্দ হলো।

মা ও মার্গারেটা নির্বাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে কেথীর কাণ্ড। আর কেথীও যেন মজা পেয়েছে বহুদিনের গা-সওয়া ভূতের কার্যকলাপে। এইভাবে কেথী যতবার শব্দ করে, ঘরের কোণ থেকে ততবার শব্দ হয়। কেথী এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, মা দেখ, আমার কথা ও বোঝে। বলেই জিজ্ঞাসা করলো সে, আচ্ছা, তুমি দশটি শব্দ কর তো! সঙ্গে সঙ্গে দশটি শব্দ হলো।

আচ্ছা, বারোটি শব্দ কর তো! সঙ্গে সঙ্গে বারো বার শব্দ হলো।

ফক্স-গৃহিণী ও মার্গারেটার ভয় যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ ভাবছেন, কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না ঘরে, তবে কে শুনছে আমাদের কথা? কে-ই বা উত্তর দিচ্ছে? তবে কি প্রেতাত্মা?

এবার তিনি নিজেই প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন, বল তো আমার ক'টি সন্তান?

উত্তরে সাতবার ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হলো।

বিস্ময়ে হতবাক্ ফক্স-গৃহিণী।

আবার প্রশ্ন: আমার সাতটি সন্তানই কি জীবিত?

উত্তর হলো: ছয়। অর্থাৎ ছ'বার শব্দ হলো।

তুমি কি মানুষ?

কোনো শব্দ হলো না।

তুমি কি লোকান্তরিত আত্মা?

খুব জোরে জোরে তিনবার শব্দ হলো। ওরা বুঝলো, তিনবার শব্দ 'হ্যাঁ'-সূচক। অর্থাৎ সমর্থন।

আবার প্রশ্ন অদৃশ্য মূর্তিকে: আমার প্রতিবেশীদের ডেকে আনলে তুমি এমনিভাবে সাড়া দেবে?

আবার তিনটি শব্দ হলো।

এরই মধ্যে জন ফক্সও এ-ঘরে চলে এসেছেন স্ত্রী-কন্যাদের কথাবার্তা শুনে।

তিনি ডাকতে গেলেন কয়েকজন পড়শীকে। সবাই শুনে হাসতে শুরু করলো। এ আবার হয় নাকি? রাত্রে মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ফক্সের! যে মরে গেছে সে আবার সংকেত দিয়ে কথা বলতে পারে নাকি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথমে এসে ঘরে ঢুকলেন মিসেস রেডফিল্ড। হাসতে হাসতে তিনি অদৃশ্য মূর্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো আমার ক'টি সন্তান?

ঠক্ করে একটি শব্দ হলো ঘরের কোণ থেকে। এবার বিস্ময়ের পালা মিসেস রেডফিল্ডেরও। তাঁর একটি মাত্র সন্তান হয়ে মারা গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। তাই আবার জিজ্ঞাসা: সে জীবিত না মৃত?

এবার কোন শব্দ হলো না। তাই ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হলো, সে কী মৃত?

ঠক্ ঠক্ ঠক্—এবার তিনবার শব্দ।

মৃত পুত্রের শোকে হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন মিসেস রেডফিল্ড। যে-কৌতুক ও ঔৎসুক্য নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন তা যেন গভীর বিশ্বাস হয়ে দেখা দিল অন্তরে।

এরই মধ্যে পাড়ার অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে ফক্সের ঘরে। সবাই যে-যার মতো প্রশ্ন করছে, উত্তরও পাচ্ছে যথাযথ। সবাই হতবুদ্ধি। অবাক। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী। নাম ডক্টর ডিউস্লার। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এবার তোমার পরিচয় চাই। কে তুমি?

ডিউস্লার প্রশ্ন করতে লাগলেন। ঠিক ঠিক শব্দের দ্বারা তার উত্তরও পাওয়া যেতে লাগলো। ডক্টর ডিউস্লার এই শব্দ-সংকেত বুঝবার জন্য ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্য নিলেন। উদ্ধার হলো প্রেতাত্মার সব কথা।

প্রশ্ন হলো: তুমি কে?

উত্তর: আমার নাম চার্লস বি, রোজমা। আমি নারী। ফেরি-ওয়ালার ব্যবসাই ছিল আমার পেশা।

এখানে কি করে এলে?

আমি একদিন এই বাড়িতে নতুন জামা-কাপড় ফেরি করতে এসে-ছিলাম। তখন এই বাড়ির মালিক ছিলো জন বেল। রাত হয়ে যাওয়ায় আমি একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম মিসেস বেল-এর কাছে। তারা রাতটুকুর জন্যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। সারা দিনের আয়ের বেশ-কিছু টাকা তখন আমার কাছে। কথায় কথায় বেল-দম্পতি এটাও জেনে নিয়েছিল। এক গাঁটরি নতুন কাপড় ও জামা ঘরে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বারান্দার একটা কোণে। টাকার বাণ্ডিলটা গোঁজা ছিল আমার কোমরে। হঠাৎ গভীর রাত্রে জন বেল এলো আমার কাছে। হাতে ছুরি। ঘুম ভেঙে যেতেই বেলের এই মূর্তি দেখে আমি চীৎকার করে উঠি। কিন্তু আমার চীৎকার দূরের প্রতিবেশীদের কানে পৌঁছোবার আগেই টাকা ক'টির লোভে বেল আমাকে খুন করলো। গলায় বসিয়ে দিল ছুরির ফলা।

আমার দেহের মৃত্যু হলো। আত্মা বেরিয়ে এসে ঘরের ঐ কোণে আশ্রয় নিলো। আমি দেখতে পেলাম, আমার দেহটি নিয়ে বড় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খণ্ড-খণ্ড করে নিচের ঐ ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেললো। সেই থেকে আত্মা আমার দেহকে খুঁজে খুঁজে হয়রান

—তুমি বেলের প্রতি অত্যাচার করেই তো তোমার প্রতিহিংসা নিতে পারতে। তা না করে এই পরিবারকে ভয় দেখাচ্ছো কেন?

—সে চেষ্টাও করেছি। বেলকে যেদিন আমি দেখা দিই, তার পরের দিনই ওরা এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। প্রেতাত্মার ভয়ে। ওকে আমি গলা টিপে মারতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু বেল যে বাড়িতে গেছে সেখানেও তো তুমি যেতে পারতে।

—হ্যাঁ পারতাম। কিন্তু আমার দেহ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তাই তো তোমাদের সব জানাচ্ছি।

—তুমি এই পরিবারের অন্যেরা থাকতে ছোট্ট মেয়ে কেথীর ওপর অত্যাচার করতে কেন?

—কারণ কেথীর শরীরে আকর্ষণী শক্তি খুব বেশি। ও ভালো মিডিয়াম। তাই আমার পক্ষে ওর ওপরে ভর করা খুব সহজ হতো।

—তুমি এ বাড়ি ছাড়বে কবে?

—আমার দেহ এই গর্ত থেকে তুলে তোমরা কবরখানায় কবর দাও তাহলেই আমাকে আর তোমরা দেখতে পাবে না। উঃ! আমার বড় কষ্ট। আর কথা বলতে পারছি না।

শব্দ-সংকেত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

প্রভাত হতে-না-হতেই সর্বত্র লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লো ফক্স-পরিবারের এ-কাহিনী। সবাই ছুটে এলো কেথীকে দেখতে।

বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের নিচের মাটি খুঁড়ে দেখা গেল সত্যিই একটি নারীর কংকাল। হাতের বালা দুটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আর রয়েছে কিছু কাঁচা পয়সা—কয়েন। যথারীতি কংকালটি তুলে নিয়ে দূরের কবরখানায় কবর দেওয়া হলো।

পরের দিন থেকে আতংকমুক্ত হলেন ফক্স-পরিবার।

মৃত্যুর পরেই রামদাস সেনের আত্মা দেখা দিয়ে গেল রামগতি ন্যায়রত্নের সঙ্গে, তাঁর ক্লাসে এসে

আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (জুলাই ১৮৭২-এ প্রকাশ) বইখানা পড়েছেন। কেউ-কেউ ১৮৫৮-এ প্রকাশিত 'কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ' এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস', ১৮৫৯-এ প্রকাশিত 'বস্তুবিচার' বই দু'টিও দেখেছেন। অনেকে বলবেন, কেন, 'রোমাবতী', 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'ইলছোবা' ইত্যাদি বইগুলি বা কম কিসে ?

হ্যাঁ। প্রথম বইটি রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) মশাইয়ের কীর্তিস্তম্ভরূপে বিবেচিত হলেও অন্যান্য বই কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে কম মূল্যবান নয়।

ছাত্র হিসেবে রামগতি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৮৪৯-এ প্রথমবার জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেলেন মাসিক আট টাকা হিসেবে। পরের বৎসর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও এই বৃত্তি-পরীক্ষায় প্রথম

হলেন এবং বৃত্তি পেলেন মাসিক আট টাকা। সিনিয়র বৃত্তিতেও দ্বিতী
স্থান অধিকার করে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পেলেন।

শিক্ষা-জীবন শেষ করে রামগতি চাকরি-জীবনে প্রবেশ করলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেছে তিনি। এক সময়ে (১৮৬৫) তিনি বহরমপুর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এছাড়া হুগলি নর্মাল স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিত, বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকরূপে চাকরি করেছেন।

বহরমপুরে থাকতে ওখানকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ রামদাস সেনের (১৮৪৫-১৮৮৭) সঙ্গে রামগতির সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। রামগতি বয়সে বেশ বড় হলেও পান্ডিত্যের আকর্ষণে দুজনই বোধ করি সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া 'বঙ্গদর্শন', 'নবজীবন'. 'নব্য-ভারত' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার বিশিষ্ট লেখক হিসেবে রামদাস সেন তৎকালে সমসাময়িক অনেকের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সময় পেলেই পড়াশোনা করার জন্য রামগতি চলে যেতেন রামদাস সেনের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে। দেখবার মতো গ্রন্থাগার। দেশ-বিদেশের কত বই এখানে সংগ্রহ করেছেন রামদাস। দুজনের কত আলাপ, কত আলোচনা চলতো এই লাইব্রেরিতে বসে। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকেন রামগতি রামদাসের মুখের দিকে। কি ধর্ম, কি পুরাবৃত্ত, কি সঙ্গীত—সব বিষয়ের প্রকাণ্ড আধার যেন রামদাস সেন। আলোচনা করেও কত আনন্দ!

রামগতি বহরমপুরের চাকরি শেষ করে ১৮৭৯-তে চলে হুগলিতে। সেখানকার নর্মাল স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি নিলেন তিনি বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে এই স্কুলে। আজন্ম শিক্ষাব্রতী ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে আনন্দে কাটান।

বৈঁচির (হুগলি) মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩১৫-র জ্যৈষ্ঠ সং 'পন্থা'য় রামগতির সম্বন্ধে যে অলৌকিক বিবরণটি প্রকাশ করলেন, পড়লে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

সেদিন ছিল আগস্টের ১৯ তারিখ। সালটা ১৮৮৭।

প্রথম শ্রেণীতে পড়াচ্ছেন রামগতি। নিবিষ্ট মনে ছাত্ররাও পাঠ গ্রহণ

করছে। বেলা ঠিক একটা।

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান পাশের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন,—আপনি এখানে? কখন এলেন?—বলেই বসে পড়লেন আবার।

কয়েক দণ্ড মাত্র। পণ্ডিত মশাইয়ের এই অদ্ভূত কাণ্ডে ছাত্রেরা হতচকিত। পণ্ডিত মশাইয়ের মাথা খারাপ হলো নাকি? তাঁর এমন ধারা আচরণ তো তারা কোনো দিন দেখেনি।

রামগতি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। কি দেখলেন তিনি তাঁর ডানপাশে? ক্ষণিকের জন্য কে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল? বহরমপুরের রামদাস সেন কি তবে—

না, আর ভাবলেন না তিনি। ছাত্রদের বললেন, তোমরা আমার আচরণে খুব বিস্মিত হয়েছ দেখছি। হবারই কথা! তবে শোনো, এখন এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলছি না। পরে একদিন জানাবো তোমাদের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, আজ আর পড়াতে ভালো লাগছে না। তোমাদের ছুটি। বলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন রামগতি।

বিস্ময়ের সীমা নেই তাঁর। কেন হঠাৎই রামদাসবাবুকে ক্লাসে দেখতে পেলেন তিনি! তিনি তো কোনো চিন্তাই করেননি তাঁর সম্বন্ধে! 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বলে একটা কথা আছে। কিন্তু যেখানে রজ্জুই নেই সেখানে সাপ বলে ভুল করবেন কেন তিনি?

সেদিন সর্বক্ষণ কাটালো তাঁর এই চিন্তায়।

পরের দিন স্কুলে এসেছেন রামগতি। বেলা তিনটে। এক পিওন এলো তাঁর কাছে। হাতে টেলিগ্রাম।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে পড়লেন রামগতি: Ramdas Sen expired yesterday at 1 p. m.।

মনটা তাঁর দুঃখে-বেদনায় হাহাকার করে উঠলো। বহরমপুরের কত সুখ-স্মৃতি তাঁর মনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো।

প্রিয়জনকে বোধ করি এভাবেই প্রিয়জনের আত্মা বার-বার দেখা দিয়ে যায় স্থূলদেহ ধারণ ক'রে। মনে করিয়ে দেয় কবির কথা, 'আমি তো তোমাকে ভুলিতে পারিনি পরজনমে এসে।'

ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সাধক মনীষী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিশচন্দ্র মুখার্জির প্রেতাত্মা আনিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহায্যে কলকাতায় বসে

'একদিন আমার এক বন্ধু ও আমি আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময়ে মনে হইল যে, কোন আত্মা আসিয়া আমাকে অধিকার করিলেন। তিনি আমার মুখ দিয়া কথা বলাইতে লাগিলেন। আমার জ্ঞান ছিল, আমার মুখ দিয়া কি কথা বলা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম।'

এই 'আমি'টি কে ?

ইনিই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত প্রচারক ও মনীষী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৯১৩)। বাড়ি ছিল হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়। কৃষ্ণনগরে পড়াশোনা করার সময়ে মনীষী রামতনু লাহিড়ীর সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এক সময়ে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদও লাভ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো।

কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসেন ১৮৭১-এ। ১৮৭৮-এ সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণী। জীবন-মন সমর্পণ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে।

শুধু ব্রাহ্মধর্মই বা বলবো কেন? দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার প্রসারকল্পে নগেন্দ্রনাথ কি কম চেষ্টা করেছেন? 'হিন্দুমেলা'র স্বদেশপ্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন, 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার সময়ে সুরেন বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে সব সময় থেকেছেন। এমন কি বিধবা-বিবাহের সমর্থক হিসেবেও প্রচুর কাজ করেছেন।

এ-সব ছাড়াও তিনি 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' রচনা করেছেন, রচনা করেছেন 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা', 'থিয়োডোর পার্কারের জীবনী', 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' প্রভৃতি গ্রন্থ।

এই নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেহে সেদিন ভর করেছে পরলোকের কোনো আত্মা। আত্মা নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যে-কথা বলাতে চাইছে, নগেন্দ্রনাথের সন্দেহ হলো, সে-কথা তাঁর নিজের মনের কথা—ও তো আত্মার কথা নয়।

আত্মার শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে লাগলেন নগেন্দ্রনাথ।—আমি ও-কথা বলবো না। কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে তুমি বলাতে পারবে না।

তোমাকে বলতেই হবে—আত্মারও জিদ্।

'দুইটি শক্তিতে যুদ্ধ চলিল। তখন আমার দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিয়া তুলিয়া আমিই আমাকে বলিলাম, তুমি বলিবে না? তুমি বলিবেনা? যেন আমি দুই জন হইয়া গেলাম। একজন বলাইবে, আর একজন বলিবে না। যখন আমি কিছুতেই বলিলাম না, তখন আমার সেই নিকটস্থ বন্ধুর প্রতি আমার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমারই মুখ দিয়া কে বলিলেন—তুমি বলিবে না, তবে আমি ঐ কথাটি ইহার দ্বারা লিখিব।'

প্রকৃতই বন্ধুটি লিখলেন : মহাত্মাদের ইচ্ছা যে তোমাকে মিডিয়ম করে এদেশে ধর্মপ্রচার করেন।

জ্ঞান ফিরে আসতেই প্রকৃতিস্থ হলেন নগেন্দ্রনাথ। বন্ধুর লেখা কাগজখানি দেখে বিস্ময়ে হতবাক্। এই কথাটিই তো তিনি আত্মার নির্দেশে লিখতে চাইছিলেন না।

নগেন্দ্রনাথ কিশোর-বয়স থেকেই অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী।

যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন একদিন শুনলেন, যশোহরের এক গ্রামে পরলোক-চর্চার আসর বসে নিয়মিত। একদিন চলে গেলেন তিনি যশোহরের প্রখ্যাত আধ্যাত্মবাদী শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ি। স্বচক্ষে দেখে এলেন প্রেতচক্রের ব্যাপারটি।

ফিরে এসে কৃষ্ণনগরে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বসালেন প্লানচেটের আসর। একদিন অনুভব করলেন আসরে বসে, মিডিয়ম হবার শক্তি তাঁর প্রচণ্ড। এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'আত্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে জানালেন: 'আমি কথা বলিবার মিডিয়ম (Medium) হইয়াছি। ইহা ভিন্ন আমি পরলোক-বাসীদিগকে দেখিতে পাই, কিন্তু দেখা অপেক্ষাও তাঁহাদের কথা শুনিবার শক্তি আমার অধিক।'

নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক। ব্রাহ্মধর্মের একনিষ্ঠ সাধক তিনি। তবুও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। গভীরভাবে বিশ্বাস করেন পরলোক-তত্ত্বে। তিনি বিশ্বাস করতেন, এমন একদিন আসবে যখন সমগ্র পৃথিবীকে এই পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করতেই হবে। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, যারা প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তাদের বোঝাবার জন্যেই পরলোকগত আত্মা তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। অতএব প্রেততত্ত্বের প্রচার তাঁকে করতেই হবে।

নগেন্দ্রনাথের স্ত্রীও প্লানচেটে বসতেন মিডিয়ম হয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে।

একদিন চক্রে বসে এক অপরিচিত আত্মাকে আনালেন এঁরা। মিডিয়ম তাঁর স্ত্রী।

প্রশ্ন করলেন নগেন্দ্রনাথ, আপনি এমন কিছু বলুন যা আমরা জানি না।

মিডিয়ম কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তারপর উত্তর হলো, তোমরা যা জানো না, আমি বললে তা বিশ্বাস করবে কি করে?

আপনার বলার পর তা অনুসন্ধান করে জানবো।—নগেন্দ্রনাথের উত্তর।

মিডিয়ম সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তোমরা জানো?

নিশ্চয়ই। তিনি বিরাট সাধক। তাঁকে সবাই চেনে।

তিনি এখন শান্তিপুরে আছেন।

তাও জানি।

তিনি একখানি নাটক লিখছেন এখন।

না, এ-খবর আমাদের জানা নেই।

অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবে।—একথা বলেই বিদায় নিলো বিদেহী আত্মা।

পরের দিনই চিঠি লিখলেন নগেন্দ্রনাথ শান্তিপুরে। জানতে চাইলেন বিজয়কৃষ্ণ বর্তমানে নাটক-রচনায় ব্যাপৃত আছেন কিনা।

গোস্বামী মশাই প্রশ্নোত্তরে জানালেন, তিনি এখন একখানি নাটক লিখছেন।

এমন ভাবে অনেক বারই আত্মার কথা যাচাই করেছেন নগেন্দ্রনাথ। প্রতিবারই সফল হয়েছেন :

কেন, সেবার কি হয়েছিল ?

বন্ধুদের নিয়ে প্রেতচক্রে বসেছেন তিনি। বন্ধুদের মধ্যে 'অবলা বান্ধব'-এর সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও (১৮৪৪-১৮৯৮) আছেন। তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সেদিন এক মজার কাণ্ড হলো।

টমসন নামে এক সাহেবের আত্মা এলো প্রেতচক্রে।

প্রশ্ন করা হলো : তুমি বাংলায় কথা বলতে পারো ?

হ্যাঁ পারি। আমি বাংলা দেশে অনেক দিন ছিলাম—আত্মার কথার টানে ইংরেজী উচ্চারণের ভাব।

বেশ, তুমি যদি প্রকৃতই এসে থাকো তাহলে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করো।

কি করতে হবে বলো !

আমাদের এই টেবিলটাকে শূন্যে তুলেধরো।

আশ্চর্য ! ধীরে ধীরে চক্রের টেবিলটা সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে লাগলো।

নগেন্দ্রনাথের কথায় : 'প্রত্যেকের আঙুল টেবিল স্পর্শ করিয়া রহিল। চক্রের কাহারও হস্তদ্বারা যে টেবিল উর্ধ্বে তোলা হয় নাই, তাহা

আমরা প্রত্যেকে ভালভাবে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলাম। তখন আমি মাটিতে বসিয়া দেখিলাম, টেবিল ঠিক শূন্যে ঝুলিতেছে।'

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত। এও কি সম্ভব? তাঁরা আতঙ্কিত ও ভয়ার্ত। যে-ঘরে তাঁরা বসে আছেন সেই ঘরেই প্রেতের উপস্থিতি! গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। রোমাঞ্চিত দেহ-মন।

সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন নির্ভীক নগেন্দ্রনাথ। না, সবাই সংযমী হয়ে বসে আছেন যে-যার স্থানে!

কিন্তু একি! দ্বারকানাথের চোখের পলক পড়ছে না কেন? তবে কি—

কয়েক মুহূর্ত টেবিলটা শূন্যে ঝুলে থেকে আবার নিচে নেমে এলো। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিকে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। অর্ধনিমিলিতচোখ।

জ্ঞান হারিয়েছেন দ্বারকানাথ।

নগেন্দ্রনাথের সুহৃদ্ শিবনাথ শাস্ত্রীও (১৮৪৭-১৯১৯) নগেন্দ্রনাথের অলৌকিক শক্তির কথা জানতে পেরেছিলেন। নগেন্দ্রনাথের সুখে-দুঃখে শিবনাথ ছিলেন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ব্রাহ্মসমাজের অনেক সদস্যই যখন নগেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, তখনও শিবনাথ তাঁর সঙ্গ ছাড়া হননি। তাঁদের এই সখ্যতার বর্ণনা করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত'-এর বিভিন্ন স্থানে। একটুখানি উদ্ধৃত দিলে তা আরো স্পষ্ট হবে: 'আমার ভবানীপুরে বাসকালে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বড় দারিদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। আগেই বলিয়াছি, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একযোগে কার্য করিবেন বলিয়া, কৃষ্ণনগরের কর্ম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া কেশববাবুর ভারত-আশ্রমে উঠিয়াছিলেন; কিন্তু কেশববাবুর ও তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দের সহিত মতভেদ ঘটিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত কিছুদিন স্বতন্ত্র বাসায় থাকিলেন, কিন্তু অতি কষ্টে তাঁহার দিন নির্বাহ হইতে লাগিল। হরিনাভিতে বাসকালে আমি আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়াছিলাম এবং প্রতি শনিবার সেখানে আসিতাম।

আমি যথাসাধ্য নগেন্দ্রবাবুর ব্যয়ের সাহায্য করিতাম, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নিবারণ হইত না। তৎপরে আমি যখন ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া আসিলাম, তখন বিরাজ-মোহিনীকে হরিনাভিতে সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট রাখিয়া, নগেন্দ্র-বাবুকে সপরিবারে আমার ভবানীপুরের বাসায় আনিয়া রাখিলাম ; এবং তাঁহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলাম।'

একদিন এই সুহৃদ্ শিবনাথের ইচ্ছে হলো নগেন্দ্রনাথের প্রেতচক্রে উপস্থিত থেকে ব্যাপারটা একটু প্রত্যক্ষ করা। ভেল্‌কি কিনা তা দেখা।

আয়োজনও করা হলো চক্রের।

উপস্থিত হলেন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শিবনাথ। আছেন নগেন্দ্র-নাথের স্ত্রী আর নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

আজকের মিডিয়মও নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী। চক্রে বসে কিছুক্ষণ পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন স্ত্রী।

বার বার ডাকা হলো তাঁকে। কোনো সাড়া নেই মিডিয়মের। তখন তিনি হতচেতন।

নগেন্দ্রনাথ এবার শিবনাথকে প্রশ্ন করতে বললেন। কাগজ রাখা হলো টেবিলে। মিডিয়মের হাতে গুঁজে দেওয়া হলো একটি পেন্‌সিল।

শাস্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে প্রেতাত্মার কথোপকথন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ইতিহাসবিদ্-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ? আপনার নাম লিখুন।

মিডিয়ম নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী লিখলেন, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সবাই। তবুও সন্দেহ যায় না শিবনাথের। সত্যিই কি হরিশবাবুর আত্মা এসেছে ? জিজ্ঞেস করলেন আবার—আপনার নিবাস কোথায় ছিল ?

উত্তর হলো—ভবানীপুরে।

মৃদু হাসির রেখা শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে। প্রশ্ন করলেন এবার—জীবদ্দশায় কি করতেন ?

ধীরে ধীরে সন্দেহের রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে শিবনাথের মুখ থেকে।

উত্তর লেখা হলো ঃ হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম।

এবার নিঃসংশয় প্রশ্ন ঃ আপনি তো খুব ভালো ইংরেজি লিখতে পারতেন, তবে এই মিডিয়মের মাধ্যমে ইংরেজি লিখুন না কেন ?

মিডিয়ম তো ইংরেজি লিখতে জানেন না !—উত্তর হলো।

অবাক্ কাণ্ড ! কবে সেই হরিশচন্দ্র মারা গেছেন ১৮৬১-র ১৬ জুন। তখন শিবনাথের কত বয়স ? চৌদ্দ-পনেরো বছরের যুবক তিনি। আর নগেন্দ্রনাথ ? তারও বয়স আঠারো-উনিশ। কিন্তু মিডিয়ম নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ? তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথাই তো জানবার নয় হরিশচন্দ্রের ! তবে ?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বললেন শিবনাথ ঃ আমরা এটাই চাইছি। মিডিয়ম ইংরেজি জানেন না অথচ আপনি তাঁকে দিয়ে ইংরেজি লিখিয়ে নিন !. এর থেকে আশ্চর্য হবার আমাদের আর কিছুই থাকবে না।

আমি চেষ্টা করবো। আপনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করুন।

'তখন শাস্ত্রী মহাশয় কঠিন ইংরাজী ভাষায় 'অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন এবং মিডিয়ম দ্বারা প্রত্যেকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর লেখা হইল। এক্ষেত্রে মিডিয়মের ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ অচেতন অবস্থায় তিনি সেইসব কঠিন ইংরাজী ভাষার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লিখিলেন কিরূপে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।'

লর্ড ব্রুহাম ও বাদ যাননি প্রেতাত্মার কবল থেকে

পৃথিবীতে লর্ড ব্রুহামের (Lord Brougham, ১৭৭৮-১৮৬৮) নাম শোনেননি, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম আছে। তিনি কে ছিলেন, এদেশে হয়তো অনেকে জানে না। কিন্তু 'ব্রুহাম' মোটর গাড়ির নাম শোনেনি, এমন কি কেউ আছে? যেমন, একশ্রেণীর ব্যাগ ব্যবহার করতেন গ্ল্যাড্‌স্টোন, সেজন্য সেই ব্যাগের নাম হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোন্‌ ব্যাগ। ঠিক তেমনি, লর্ড ব্রুহাম ব্যবহার করতেন যে-শ্রেণীর গাড়ি তাকেই 'ব্রুহাম' বলা হতো। বিশ শতকের গোড়ায়ও কলকাতায় এই ব্রুহাম (১৯০৪-এর মডেল) মোটর গাড়ির প্রচলন ছিল। তৎকালীন বিজ্ঞাপনে দেখা যায় সে-গাড়ির অবয়ব। গাড়ির ছবির নিচে লেখা '12 H. P. Single Brougham for Town use. Body work by Dykes & Co., Calcutta. Specially suitable for Medical men,' কেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বলেই দিয়েছেন, 'উচ্চদরের ডাক্তার বা জজ প্রভৃতি, যাঁহারা আপনাদের গাম্ভীর্য-গৌরব বাহিরে বজায় রাখিতে প্রচলিত রীতি

অনুসারে বাধ্য হইতেন—ভিতরে তাঁহারা যতই কোন মদমাতাল বা হল্লাবাজ হৌন না – তাঁহারাই সাধারণতঃ ব্রুহাম গাড়ি ব্যবহার করিতেন। ব্রুহাম গাড়ির আরোহীদিগকে দেখিলে সকলের মনে একটা মহা সমীহ ভাব জাগিয়া উঠিত—মনে হইত, না জানি, আরোহী হাইকোর্টের কোনো জজ বা মেডিকেল কলেজের কোনো বড় ডাক্তার।' এত মর্যাদা বুহামের ?

কিন্তু কে ছিলেন এই লর্ড বুহাম ?

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংলন্ডে লর্ড বুহামকে সবাই মনীষীরূপে দেখতেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ন বুদ্ধি, অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক সম্মান এবং পদমর্যাদায় তিনি ছিলেন অসংখ্য লোকের উপাস্য দেবতা। বিরাট ধনি তিনি কোনো দিনই ছিলেন না, তবুও ধনিরা তাঁকে তাঁদের অভিভাবক হিসেবে মান্য করতেন। তাছাড়া ১৮৩২-এ 'পেনি ম্যাগাজিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। 'পেনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'ও তাঁর সৃষ্টি। বিজ্ঞানমনস্ক এই দার্শনিক-প্রতিম বুহাম ছিলেন সত্যবাদিতার প্রতীক। সর্বোপরি ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল আকাশ-ছোঁয়া। কোনো তত্ত্বেই তিনি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। আবার, যাতে তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস জন্মাতো, জগতের সামনে প্রচার করতেও তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি।

এ-হেন লর্ড বুহাম তাঁর জীবনীতে এমন একটি বিস্ময়াবহ ঘটনার কথা আমাদের জানিয়েছেন যা তাঁকে পরলোকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, মানুষের আত্মা পার্থিব দেহ পরিত্যাগের পর, পরলোকে সূক্ষ্মদেহ ধারণ ক'রে আবার পৃথিবীতে দেখা দিতে পারে।

লর্ড বুহামের স্কুলের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন জর্জ। এডিনবরা হাইস্কুলে পড়ার সময়েই জর্জের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। বন্ধুর সঙ্গে বুহামের অনেক তর্ক হতো সেই কৈশোর কাল থেকেই। বিভিন্ন বিষয়ের তর্কের মধ্যে থাকতো পরলোকের কথা।

বুহাম জিজ্ঞেস করতেন, মানুষের আত্মা কি অমর ?

জর্জ বলতেন, আমি বিশ্বাস করিনে। প্রেতাত্মার যে সব গল্প তা সত্যি নয়।

ব্রুহাম মাথা নাড়েন।—আমরা চোখে দেখি না অথচ এমন কত ঘটনাই তো পৃথিবীতে ঘটে। আত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে মানুষকে দেখা দেয়—একথাও অনেক মনীষী বলেছেন।

তাদের মাথা খারাপ। পাগল তারা। জর্জের সোজা উত্তর।

ব্রুহামও এসব কথায় বিশ্বাস করেন না। বললেন, আচ্ছা জর্জ, এর সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা যায় না?

হ্যাঁ—যায়। ঘাড় কাৎ করলেন জর্জ। বললেন, এর একমাত্র উপায় হলো, আমি যদি আগে মরি তাহলে তোমাকে আমি দেখা দেব, আর তুমি যদি আমার আগে যাও—তাহলে তুমি আমাকে সূক্ষ্ম শরীরে দেখা দিয়ো।—একটু চিন্তা করে কৌতুকমিশ্রিত স্বরে জর্জ বললেন, এরচেয়ে প্রত্যক্ষ করার মতো ভালো পথ তো আর আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ব্রুহামের মনে কথাটি ধরলো। বললেন, তাহলে আজই প্রতিজ্ঞা করি যে, মৃত্যুর পরেও যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এবং সেই আত্মা যদি জীবিত লোকে দেখা দিতে পারে তাহলে আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরকে দেখা দেবে! তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, পরলোকে আত্মা বিদ্যমান।

বেশ, তাই হোক।

শপথ নিলেন দুই বন্ধু।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কলেজের পাঠ শেষ করে জর্জ সিভিল সার্ভিসের চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন। ব্রুহাম থাকলেন এডিনবরায়।

প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলেছিল দুই বন্ধুর মধ্যে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাও বন্ধ হলো।

আরো বেশ কয়েক বছর কাটলো। দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতের দরুন ব্রুহাম ভুলেই গেলেন বাল্যবন্ধুর কথা। ব্রুহাম এখন খ্যাতির শীর্ষে। কর্মময় জীবনে পিছন ফিরে তাকাবার তাঁর অবকাশ কোথায়।

সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল বাল্য কালের অনেক কথা! কর্মময় জীবনের ব্যস্ততা কালো আবরণে ঢেকে দিলো জর্জের স্মৃতি। মুছে গেল একে একে অনেক শৈশব-সৌহার্দ্যের স্মৃতিচিহ্ন। এখন তিনি লর্ড ব্রুহাম। লণ্ডনের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিস্টার। বুদ্ধিজীবীমহলে প্রবাদ-পুরুষ।

আরও কিছুকাল কেটে গেছে ব্রুহামের কর্মবহুল জীবন-স্রোত।

সেবার এসেছেন তিনি সুইডেনে বেড়াতে। ডিসেম্বরের শীত। বরফ-জমা ঠান্ডায় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান লর্ড। বাড়িতে এসে গরমজলে স্নান করেন। জলের উত্তাপে বেশ স্ফূর্তি ও আরাম লাগে।

সেদিনও সকালে ভ্রমণে বেরিয়ে ফিরে এসেছেন লর্ড। ভৃত্যরা ব্যস্ত হয়ে স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ব্রুহাম বাথরুমে গরমজলের টবে গা ডুবিয়েছেন। কাপড়-জামা ছেড়ে রেখেছেন পাশে-রাখা একটা চেয়ারের ওপর।

দিনটা ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর।

স্নান সেরে বাথ-টব থেকে উঠতে যাবেন এমন সময় তাঁর লক্ষ্য পড়লো জামা-কাপড় রাখা চেয়ারটার দিকে। বাল্যবন্ধু জর্জ বসে আছেন চেয়ারে আর হাসছেন মিটি-মিটি ব্রুহামের দিকে তাকিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন ব্রুহাম, তুমি বাথরুমে এলে কি করে? দরজা তো বন্ধ।

জর্জের কোনো সাড়া নেই।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জর্জের দেহ আস্তে-আস্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল। এই দেখেই ব্রুহাম অজ্ঞান।

যখন জ্ঞান হলো তখন তিনি তাঁর শোবার ঘরের বিছানায় শুয়ে। পাশে ডাক্তার।

চোখ মেলেই প্রথম যে-কথাটি বললেন তা হলো—জর্জ কোথায়?

কে জর্জ—ডাক্তার শুধোলেন।

আমার বাল্যবন্ধু। জর্জ।

ভৃত্যরা বললো, এখানে তো কেউ আসেনি! অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করে যখন আপনি বাথরুম থেকে বেরুচ্ছেন না দেখলাম, তখন ডাকতে শুরু করলাম আপনাকে। তাতেও কোনো সাড়া পেলাম না। তখন বাথরুমের দরজা ভেঙে ভিতরে গিয়ে দেখি আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন টবের মধ্যেই।

মাথায় যন্ত্রনা হচ্ছে ব্রুহামের। ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়ে বিদায় নিলেন।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন লর্ড ব্রুহাম। মাথায় একটিমাত্র

চিন্তা—কেন তিনি জর্জের প্রেতাত্মাকে দেখলেন !

ফিরে গেলেন ক্ষীণ স্মৃতিতে ভর করে সেই বাল্যকালের অতীতে। হঠাৎ মনে পড়লো তাঁর শপথের কথা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন দু'জনেই—যার আগে মৃত্যু হবে সেই দেখা দেবে অন্যকে। তবে কি জর্জ মারা গেছে ! কেমন যেন চিন্তার জট পাকিয়ে যাচ্ছে লর্ডের মাথার মধ্যে। স্মরণকালের মধ্যেও তো তাঁর ভারতপ্রবাসী জর্জের কোনো কথাই মনে হয়নি ! তবে ?

এই 'তবে'র উত্তর খুঁজতে লর্ড অনেক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিলেন মনে মনে।

যখন স্নান করছিলেন গরম জলে তখন এক অনির্বচনীয় সুখ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। সুখানুভূতির মধ্যে চোখ দুটো বুজে এসে ঘুম ঘুম মনে হচ্ছিল লর্ডের। তিনি কি নিদ্রার আবেশেই এরকম দেখলেন ?

এ-যুক্তিও তাঁর মনে ধরলো না। তিনি তো নিদ্রাবেশে জর্জকে দেখেননি ! তাছাড়া বহুকাল আগের স্মৃতি তো তাঁর মনেও পড়েনি কোনো দিন !

যতবার যুক্তি-তর্ক তাঁকে ঘিরে ধরে ততবারই তাঁর মনে হয় বাল্যকালের সেই শপথের কথা। কাউকে কিছু প্রকাশ না করে ভ্রমণ সেরে এডিনবরায় ফিরে এলেন লর্ড।

বাড়িতে এসে বসতে-না-বসতেই ডাক-পিয়ন চিঠি দিয়ে গেল বুহামের হাতে। ভারত থেকে এসেছে। কয়েক ছত্র লেখা : জর্জ ১৯ ডিসেম্বর মারা গেছেন। আপনাকে জানাতে বলেছিলেন তিনি মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে।

লর্ড ব্রুহামের দু'চোখে নামলো জলের ধারা।

হরিপ্রসাদের মৃতদেহে যখন শ্রীকান্ত মুদির

প্রেতাত্মা ঢুকলো

রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় যশোহরের এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বাস করতেন। এখানে তাঁর পৈতৃক বাড়ি হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কলকাতার নাম-করা অনেক লোকের সঙ্গে। কারণ সে-সময়ে নীলচাষ নিয়ে বাংলা দেশে যে-আন্দোলন শুরু হয়, তার অনেক খবর তৎকালীন কলকাতার সংবাদপত্রে তিনি যশোহর থেকে পাঠাতেন। ফলে মাঝে-মধ্যে কলকাতায়ও তাঁকে আসতে হতো। এবং অনেক প্রখ্যাত ব্যাক্তির সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করতে যেতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এই সময়ে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। অনেক গ্রামের কেউ-না-কেউ ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরতেন—এ সংবাদ নিত্য দিনের।

সেবার, রামকান্তবাবুর বড় ছেলে হরিপ্রসাদ বেশ-কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে মারা যান। ওঁরা ছিলেন তিন ভাই। হরিপ্রসাদের বয়স তখন উনিশ! একবছর হলো বিয়ে করেছেন। বড় ছেলের বিয়ে!

অনেক খরচাপাতি করে রামকান্ত এ-বিয়েতে ধূমধাম করেছেন। বর্ধিষ্ণু পরিবার এই চট্টোপাধ্যায়-বংশ।

বাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। বালিকা-বধূ কালিতারা অহরহঃ মূর্ছা যেতে লাগলেন। রামকান্ত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো স্থির হয়ে গেলেন। শোকে অন্তরটা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। তিনি ভাঙলে তো বাড়ির সবাই ভাঙবে। মা বুকে আঘাত করে কাঁদছেন, স্ত্রী মূর্ছা যাচ্ছে, ভাইরা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাড়ির ঝি-চাকর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

তুই এমন ভাবে চলে গেলি হরি! আমার বৌমা—আর বলতে পারলেন না বাবা রামকান্ত। মাথার মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। একসময়ে তিনিও জ্ঞান হারালেন।

কে কাকে দেখে—এমন অবস্থা তখন রামকান্তবাবুর গৃহের। পাড়া-প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলেন। সকালে মৃত্যু হয়েছে হরিপ্রসাদের। বেলা বারোটা বাজতে চললো। এবার শব নিয়ে যেতে হবে শ্মশানঘাটে। আর দেরি করা চলে না।

শোকের সাগর পেরিয়ে হরিপ্রসাদের শব নিয়ে রওনা হলো প্রতি-বেশীরা। মুখাগ্নির জন্যে সঙ্গে গেলেন তাঁর ছোট ভাইরা।

বল হরি হরি বোল—ধীরে ধীরে শবযাত্রীরা এগিয়ে গেল শব কাঁধে করে। বাঁশ কেটে 'চালি' তৈরি করা হয়েছে। তার ওপর নরম শয্যায় শোয়ানো হরিপ্রসাদের নশ্বর দেহ।

খৈ ছড়াতে-ছড়াতে এগিয়ে চলছে শবযাত্রীরা। বোসেদের পানা-পুকুর ছাড়িয়ে ডান দিকেই মোড় নিয়ে সরকারী রাস্তা। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের বেশ চওড়া কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দুধারে বড়ো-ছোটো গাছের সমারোহ। আম-জাম-বট-শ্যাওড়া—সবরকম গাছই আছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছের তলায় আসতেই শবযাত্রীরা হঠাৎ থমকে থেমে গেল।

একটু দাঁড়াও তো!—একজন বললো।

কেন, কাঁধ ব্যথা করছে নাকি— অন্য জনের জিজ্ঞাসা।

না, না, তা নয়। একটু নামাও চালিটা।

নামানো হলো শবাধার।

সবাই চিৎকার করে উঠলো ঃ শবের যে চোখের পলক পড়ছে।

হ্যাঁ, ঠিকই তো! শুধু পলক পড়া নয়, ওষ্ঠ দুটোও যেন কাঁপছে। কি যেন বলতে চাইছে হরিপ্রসাদ!

রাম-রাম-রাম-রাম! সকলে রামনাম জপ করতে লাগলো।

একজন বললো, হরিপ্রসাদ মরেনি! না-মরতেই তাঁকে বিজু-ডাক্তার 'ডেড' বলে ঘোষণা করেছে।

তাই হয় নাকি ?—অন্য একজন বললো, বিজু-ডাক্তার এমন ভুল করবে ? অত-বড় পাশকরা ডাক্তার—

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে খবর গেল। ছুটে এলেন বাবা রামকান্ত। সঙ্গে ডাক্তার বিজয় বোস।

ডাক্তার দেখে অবাক্। এ কী করে হয়? এত বড় বিভ্রম আমার?

আনন্দে আত্মহারা বাবা। তিনি বললেন, এখনই বাড়ি নিয়ে চলো হরিকে। আরো বড় ডাক্তার আনবো সদর থেকে। নিরাময় করে তুলবোই।

মৃত হরিপ্রসাদ প্রাণ ফিরে পেয়েছে—এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে রটে গেল। অনেকে আসতে লাগলেন দেখতে।

হরিপ্রসাদ বাড়ি এলেন। বাড়ির শোকাচ্ছন্ন চেহারা মুহূর্তে পালটে গেল। স্ত্রী কালিতারা মাথায় ঘোমটা টেনে অসুস্থ স্বামীর ঘরে গেলেন। মা-ভাইরা গিয়ে বসলো হরিপ্রসাদের পায়ের দিকে।

রামকান্ত ছুটলেন সদরের বড়ো ডাক্তার আনতে।

আস্তে আস্তে কথা বলছেন হরিপ্রসাদ।—তোমরা কাঁদছো কেন? আমার কী হয়েছিল ?

কিছু হয়নি বাবা—মা বললেন, তুমি সেরে ওঠো, সব বলবো।

সেদিন ডাক্তার এলেন না। কারণ শহরে ফিরতে তাঁর রাত হয়ে যাবে। এলেন তার পরের দিন।

তিনি এসে দেখলেন, রোগী অনেক সুস্থ। যথাযথ ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। সব শুনে তিনিও বিস্মিত। মনে মনে বললেন, এও আবার সম্ভব নাকি ?

এদিকে গ্রামের বিজয় ডাক্তার মরমে মরে আছেন। জীবন্ত ব্যক্তিকে

তিনি মৃত বলে দিলেন! ছিঃ ছিঃ—এতকাল ডাক্তারি করেছেন, এমন ভুল তো তিনি কখনোই করেননি।

সময় বয়ে যায়। দিন গড়িয়ে মাসে পেঁছোয়। হরিপ্রসাদ এখন বেশ সুস্থ। হেঁটে-চলে বেড়াতে পারেন। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যান। কতাবার্তা বলেন। কেউ কেউ বলেন—বৌয়ের সিঁথির সিঁদুরের জোর বলতে হবে। আবার কেউ বলেন, বাপ-মায়ের পুণ্যের ফল।

রাত্রে বৌ জিজ্ঞাসা করেন স্বামীর গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে—কিন্তু তোমার শরীর সারছে না কেন গো? এত ভালো ভালো খাবার-পথ্য খাচ্ছো, গায়ের হাড় তো ঢাকা পড়ছে না।

হরিপ্রসাদ হাসেন।

মা শুনে বল্লেন, বাছা আমার কতদিন ভুগলো বলো তো! শরীরটা কি এত শিগ্‌গীর সারবে? হরি আমার যমের মুখ থেকে ফিরে এসেছে, এই তো ঢের।

এবারও হরিপ্রসাদ হাসেন। বলেন, মাগো, তোমাদের কত আদর-যত্ন, কত সেবা—এই তো আমার অনেক। হাড়গুলো নাই বা ঢাকলো মাংসের মধ্যে।

এ কি অলক্ষুণে কথা?—কালিতারা বলেন, তোমার খাওয়া আগের থেকে কত বেড়েছে বলো তো, এতেও যদি দেহ না সারে তবে সারবে কবে?

হ্যাঁ। খাওয়া বেড়েছে বৈকি হরিপ্রসাদের। আগে সুস্থ থাকতে যে-পরিমাণ খেতেন তিনি, এখন তার তিনগুণ বেড়েছে! তাছাড়া খাওয়ার ধরনটা আগের মতো নেই। যা পান, গপ-গপ করে এক নিমেষে নিঃশেষ করে দেন।

মা বলেন, রোগ-ভোগের পর সবাই এরকম হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বৌমা!

এমনি ভাবো কাটে আরে ছ'টি মাস। হরিপ্রসাদের দেহে কিন্তু মাংস নেই, সেই হাড়গুলোই সম্বল।

একদিন রাত্রে হরিপ্রসাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় এসে শুয়েছেন। স্ত্রী কালিতারা এলেন ঘরে। পেটটা তাঁর ভালো নেই। দুপুরে অবেলায় খেয়ে বদহজম হয়েছে। রাতে যদি একটা পাতিলেবু পেতেন, জলে দিয়ে খেতেন। কিন্তু এত রাতে কেই-বা বাগানে যাবে লেবু তুলতে !

স্বামী শুনে বললেন, বেশ তো, আমি এনে দিচ্ছি লেবু।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন কালিতারা, না বাপু, এত রাতে তোমাকে বাগানে যেতে হবে না। আমার এমনিতেই সেরে যাবে।

কেন, বাগানে যাবো কেন, এখানে বসেই তুলে দিতে পারি।

ছাই পারো ! কেন, তুমি কি ভূত নাকি ?—কৃত্রিম ক্রোধ কালিতারার কথায় ! কালিতারা গল্প শুনেছেন তাঁর পিসিদের কাছে, ভূতেরা নাকি তাদের হাত-পা যত ইচ্ছে লম্বা করতে পারে।

না, না, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ভূত নই—বলেই জানালার বাইরে হাত বাড়ালো হরিপ্রসাদ।

কালিতারা দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁর স্বামীর ডান হাতটা আস্তে আস্তে লম্বা হচ্ছে। এত লম্বা হলো যে দূরে বাগান পর্যন্ত চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার কালিতারার। এবং মূর্ছা।

বৌমার চিৎকার শুনে ছুটে এলেন শ্বশুর-শাশুড়ি।

ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখতে পেলেন, হরিপ্রসাদের বিরাট লম্বা ডান-হাতখানি ধীরে-ধীরে ছোট হয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। মুঠোয় ধরা একটা পাতি লেবু। ওঁরাও চিৎকার করে পাড়ায় সোরগোল তুললেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এলো। বললেন, এ কি কাণ্ড ! এ তো মানুষ নয়, নিশ্চয়ই অপদেবতা !

হরিপ্রসাদ কিন্তু মিটি-মিটি হাসছেন।

হাসাচ্ছি তোমাকে ব্যাটা !—বলে পাড়ার কয়েকজন কৈবর্তপাড়ার ছিদাম দাস ওঝাকে আনতে গেল। নিস্তব্ধ থমথমে বাড়ি। সকলেরই এক চিন্তা ঃ এ কি হলো ?

ওঝা এলো। একঘটি জলে ফুঁ দিয়ে ভূতের মন্ত্র পড়তে লাগলো। হরিপ্রসাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ তীক্ষ্ম হতে লাগলো। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে জল-পড়া ঘটিটার দিকে।

ওঝা খানিকটা মন্ত্রপূত জল হরিপ্রসাদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েই

জিজ্ঞেস করলে, বল্ তুই কে ?

প্রথমে চুপ করে রইলো হরি। শুধু চোখ দুটো দিয়ে যেন রক্ত ঠিকরে বেরুচ্ছে !

আবার জিজ্ঞাসা ঃ কে তুই ? বলবি না ? তারপর হরিপ্রসাদের মাকে বললো, এক গাছা ঝাঁটা দিন তো আমাকে।

এবার মুখ খুললো হরিপ্রসাদ।—আমায় মেরো না, আমি বলছি, আমি কে।

তবুও ঝাঁটা গাছটি আনানো হলো। ওঝা শক্ত মুঠোয় ঝাঁটার গোড়াটি ধরে রয়েছে।

বলতে লাগলো হরি ঃ আমি তোমাদের গ্রামেরই শ্রীমন্ত সরকার। আমার মুদির ব্যবসা ছিল। গ্রামের হাটের মাঝেই আমার দোকান ছিল মনে পড়ে ?

বিস্মিত সবাই। রামকান্ত বললেন, তুই আমাদের শ্রীকান্ত মুদি ? কিন্তু তুই তো মারা গেছিস অনেক দিন আগেই ! কলেরায় !

—হ্যাঁ, ভেদ-বমি হয়ে মারা যাই আমি। সেই থেকে আমার আত্মা ঐ শ্যাওড়া গাছে আশ্রয় নিয়েছে।

—কিন্তু হরিপ্রসাদের মৃতদেহে ঢুকলি কেন ?—ওঝার জেরা।

—এর থেকে ভালো জায়গা আর কোথায় ? ভালো খাওয়া-দাওয়া আদর-যত্ন আর কোথায় পাবো ? একে বাড়ির বড় ছেলে, তার ওপর আমার খুব স্নেহের ছিল হরি। না-না, তোমার বৌমার কোনো ক্ষতি করিনি আমি। এক ঘরে শুয়েছি, অসুস্থ বলে আমাকে ও মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করেছে—এই মাত্র। একটু চুপ করে থেকে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলো সে। তারপর বললো, আমি ভেবেছিলাম, এ ভুল কোনোদিন করবো না। আমি জানতে দেব না যে, আমি প্রেতাত্মা। সেই ভাবেই চলছিলাম এতদিন ধরে। কিন্তু ভুল করেই আমার এই বিপদ। এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ওঝা বললো, কখন তুই যাবি এখান থেকে ?

—আমাকে মেরো না, আমি এখনই যাবো।

—তোর যাওয়া আমরা টের পাবো কি করে ?

—তোমরা দরজাটা ভেজিয়ে দাও। আমি যাবার সময় ওটা খুলে

দিয়ে যাবো। আর উঠোনের ঐ গন্ধরাজ ফুলের গাছটির ডাল ভেঙে দিয়ে যাবো।

সবাই দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো। দরজাটা ভেজিয়ে দিলো ওঝা ছিদাম দাস।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সবাই চেয়ে আছে হরিপ্রসাদের দিকে। বিরাট গোল-গোল চোখ দুটো তার যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দাঁতে দাঁতে ঘসা লেগে বিকট শব্দ হচ্ছে তার মুখ থেকে। গোঙাচ্ছে হরিপ্রসাদ। গালের এক পাশে গ্যাঁজলা।

হঠাৎ একটা বাতাসের দমকা হাওয়া এসে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওঝা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলো, গন্ধ-রাজ ফুলের একটা ডাল কে-যেন টেনে ভেঙে দিয়ে গেল। এতক্ষণ বিছানায় বসে থাকা হরিপ্রসাদের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়লো বিছানায়।

এই শয্যাই হলো তার আবার শেষ শয্যা।

বাড়িময় কান্নার রোল উঠলো রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে। ও হরি তুই কোথায় গেলি—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ

অতিরিক্ত পার্থিব দেহ গঠন করে নিজের আত্মাকে তার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারতেন

স্বামী যোগানন্দ (? -১৯৫২) তখনও এ-নাম গ্রহণ করেননি। তিনি তখনও মুকুন্দলাল ঘোষ। প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ বিষ্ণুচরণ ঘোষের সহোদর। পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ। পরবর্তী কালে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে স্বামী যোগানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ১৯২০-তে বি এ পাশ করেন। তারপর চলে যান আমেরিকায়। বোস্টন শহরে প্রতিষ্ঠা করেন 'যোগদা সঙ্ঘ'। এর প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে লস্ এঞ্জেলস্-এ। সেটা ১৯২৫-এ। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করা। ক্যালিফোর্নিয়ায়ও তিনি গড়ে তুলেছিলেন Self Religion Fellowship। সংক্ষেপে যার নাম S. R. F. ভারতের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলেছিলেন যোগদা-মঠ।

যৌবন থেকেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে একাগ্র-চিত্ত মুকুন্দলাল। তবুও কেমন যেন সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকেন তিনি। সাধু-সন্ন্যাসী তিনি অনেক দেখেছেন বাল্যকাল থেকে। আশ্চর্য সব অলৌকিক গল্পও

শুনেছেন এঁদের সম্বন্ধে অনেকের মুখে। কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারছেন কোথায় ?

হ্যাঁ। করেছিলেন সেবার। তখন তিনি কলেজের ছাত্র। বাবাকে গিয়ে বললেন, আমি কাশী যাবো। বেড়াতে। আপনি অনুমতি দিন।

বাবা ভগবতীচরণ চিন্তায় পড়লেন। বললে , তুমি একা যাবে বিদেশে, এটা কি ঠিক হবে ?

কেন হবে না ! আমি কি এখনো ছোট্ট খোকাটি আছি ? কলেজে পড়ছি ! বড় হয়েছি। বিদেশ-বিভুঁই বলে একা ঘুরে আসতে পারবো না ?

অনেক চিন্তা করে ভগবতীচরণ একটা উপায় বের করলেন। বললেন, আমার গুরুভ্রাতা স্বামী প্রণবানন্দ আছেন কাশীতে। তাঁরই কাছে আছেন আমার বন্ধু কেদারনাথ। ওঁদের দু'জনকেই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি তোমার হাতে। ওঁদের কাছে উঠলে তোমার কোনো অসুবিধাই হবে না।

তাই হলো। চিঠি দুখানি নিয়ে মুকুন্দলাল কাশীতে রওনা দিলেন।

ঠিকানা খুঁজে ঠিক সময়ে তিনি এসে পেঁছিুলেন কাশীর প্রণবানন্দ-আশ্রমে। বিরাট বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন তিন তলায় স্বামীজীর ঘরে। বড়ো হলঘর। স্বামী প্রণবানন্দ বসে আছেন পদ্মাসনে একখানি চৌকির ওপর। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়। পরনে কটিবাস। কোনো এক অলৌকিক চিন্তায় আত্মমগ্ন। উজ্জ্বল চোখ দুটি অলক্ষ্য এক শক্তির প্রতি নিবন্ধ।

এই সেই মহাপুরুষ ? —সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন মুকুন্দলাল দরজার ওপাশ থেকে। তিনি তো জানেন, কে এই প্রণবানন্দ স্বামী ! বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বলে ইংরেজ সরকার একদিন তাঁকেও রেহাই দেয়নি। আর, এটা তো সেদিনের ঘটনা। ১৯২১-এর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন ডাক দিলেন বাংলার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে অকৃপণহস্তে এগিয়ে আসতে দক্ষিণ বঙ্গের দুর্ভিক্ষের সময় ? এই মহাপুরুষই তো সুন্দরবন-অঞ্চলে অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে খেতে-না-পাওয়া মানুষগুলোর সেবাকার্য চালিয়েছিলেন।

পরে সেই সেবাশ্রম হয়ে ওঠে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। প্রণব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই তো তাঁর নাম প্রণবানন্দ। নইলে তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম বিনোদ ভুঁইয়া। ফরিদপুরের বাজিতপুর গ্রামের ছেলে। অদম্য সাহস আর যোগবিদ্যায় স্থিতপ্রজ্ঞ। আর্ত মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

কিন্তু আরো বিস্ময়, আরো আবেশ, আরো বিমুগ্ধতা যে মুকুন্দলালের জন্যে অপেক্ষা করছে! এ-কথা তো মুকুন্দলাল জানেন না!

বাইরে জুতো খুলে ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন মুকুন্দলাল।

এসো—মায়াজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলেন মুকুন্দলাল প্রণবানন্দের চোখের দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই। সেই চোখ। যে-চোখে বিচ্ছুরিত হয় কোপানল—মানুষের অমঙ্গলের হেতুগুলো ভস্মীভূত করতে, আবার সেই চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি ঝরে পড়ে আর্ত মানুষের উদ্ধারে।

কাছে এগিয়ে গেলেন মুকুন্দলাল। প্রণাম করলেন দুপায়ে হাত দিয়ে। পকেট থেকে চিঠি বের করছেন। এমন সময় শুনলেন প্রণবানন্দের কণ্ঠস্বর—তুমিই তো ভগবতী বাবুর পুত্র? কলকাতা থেকে আসছো!

স্তব্ধ বিস্ময়ে বুক পকেটে চিঠিটার ওপরই হাতটা তাঁর আটকে গেল! ও হরি! জানা নেই, শোনা নেই, এ পর্যন্ত যাঁর সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও দেখা হয়নি তাঁর, কেবলমাত্র সবার কাছে তাঁর নামটি শুনেছেন, তিনি পরিচয়পত্র ছাড়াই কী করে চিনলেন মুকুন্দলালকে? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে চিঠিখানি হাতে দিলেন তাঁর। কিন্তু বাবার দেওয়া এই পরিচয়পত্রের কি আদৌ দরকার ছিল? কি জানি: ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না মুকুন্দলাল।

কই কেদারবাবুর চিঠি কই?

বিস্ময়-বিমূঢ়চিত্তে তাঁর পিতৃবন্ধু কেদারবাবুর চিঠিটাও দিয়ে দিলেন তিনি প্রণবানন্দের হাতে।

চিঠি দুখানি পড়ে কয়েক মুহূর্তে চোখ বুঁজে বসে রইলেন প্রণবানন্দ। কণ্ঠ তাঁর নির্বাক্, দেহ নিস্পন্দ, নিথর। যেন তপস্যাবিলীন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর চোখ খুলে বললেন, তোমাকে

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তিনি গঙ্গায় স্নান করতে গেছেন। এই নাও তাঁর পত্র। তুমি নিজে তাঁকে দিয়ো।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে বসে রইলেন মুকুন্দলাল। হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল দোতলার সিঁড়িতে। ঐ এলেন কেদারবাবু— স্বামীজীর কথা শুনেই মুকুন্দলাল ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে নেমে এলেন কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। গৌরবর্ণ, ক্ষীণদেহ। তাঁকে দেখেই মুকুন্দলাল জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি কেদারবাবু? কেদারবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, ও, তুমি! তুমিই তাহলে অপেক্ষা করছো আমার জন্যে? তুমিই ভগবতীবাবুর পুত্র?

আমিই যে অপেক্ষা করছি এ-সংবাদ আপনি পেলেন কি করে? স্বামীজীর কাছে শুনলাম, আপনি স্নান করতে গেছেন গঙ্গায়।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। স্বামীজী নিজেই আমাকে খবর দিতে গিয়েছিলেন গঙ্গার ঘাটে।

অধিকতর বিস্ময়ে হতবাক্ মুকুন্দলাল!—কিন্তু কী করে? ঘরে তো মাত্র দু'জনই আমরা বসে ছিলাম। অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি এ-ঘরে গত এক ঘণ্টার মধ্যে আসেনি। তাছাড়া—

তাছাড়া—মুকুন্দলালের মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে কেদারবাবু বললেন, তুমি ভাবছো, ঘর থেকে তো স্বামীজীও উঠে একবারের জন্যেও বাইরে যাননি! এই তো? চলো, ওপরে চলো—

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলে চলেছেন কেদারবাবু—দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ এই পার্থিব জগতে থেকে পারলৌকিকের কতটুকু উপলব্ধি করতে পারি? এই উপলব্ধির জন্যেও তো আধার তৈরি করতে হয়। আর এই আধার হলো মানুষের মন। যার পাত্র অর্থাৎ মনটাই তৈরি হয়নি, তার এসবেরও উপলব্ধি আসবে কোত্থেকে? কিন্তু এঁরা যে মহাপুরুষ। কর্মে সাধনায় উচ্চমার্গের অধিবাসী। মনীষী।—বলতে লাগলেন কেদারবাবু, আমার সবে যখন স্নান সারা হয়েছে, তখনই প্রণবানন্দজী গিয়ে আমাকে বললেন, তুমি এসেছো কলকাতা থেকে। ভগবতীবাবুর পুত্র। আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছো।

আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। এক সঙ্গেই যাবো। বললেন,

তুমি এসো তাড়াতাড়ি। আমার একটু কাজ আছে, আগে চলে যাচ্ছি। তাছাড়া ছেলেটি একলা বসে আছে।

সব কেমন যেন তালগোল প্যাকিয়ে যেতে লাগলো মুকুন্দলালের। সারাক্ষণ আমার সামনে ঘরে বসে যে-ব্যক্তি, তিনি গঙ্গার ঘাটে যান কি করে ?

কেদারবাবু বললেন, উনি পারেন। ঠিক এখন যে-বেশে আছেন সেই বেশেই তিনি আমাকে ডাকতে গিয়েছিলেন। পায়ে সেই খড়ম জোড়াটি।

ওঁরা ঘরে এলেন। কেদারবাবু বললেন, ঐ দেখ চৌকির নিচে সেই খড়ম জোড়াটি রয়েছে।

এও কি সম্ভব ? আত্মা এক দেহ ছেড়ে একই ব্যক্তির অন্য পার্থিব দেহে প্রবেশ করতে পারে ? এই মহাপুরুষ কি অন্য এক অতিরিক্ত দেহ গঠন করে কাজে লাগাতে পারেন ? —চিন্তায় ডুবে গেছেন মুকুন্দলাল।

হঠাৎ চমক ভাঙলো তাঁর প্রণবানন্দের কণ্ঠস্বরে।—এ-সব কী চিন্তা করছো তুমি ? অত স্তম্ভিত হবার কিছু নেই। যোগীদের কাছে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বলে কিছু নেই। আমি এখানে বসেই সুদূর কলকাতায় শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে দেখা করি। প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও বলে আসি।

মুকুন্দলালের সন্নত চিত্ত লুটিয়ে পড়লো স্বামী প্রণবানন্দের চরণে। এই মুকুন্দলালই সন্ন্যাসজীবনে স্বামী যোগানন্দ।

যুক্তিবাদী ও অলৌকিক-রহস্যে অবিশ্বাসী প্রখ্যাত

ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও

হার মেনেছেন প্রেতাত্মার কাছে

'কোনো লৌকিক কৈফিয়তের দ্বারা অলৌকিক ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন বোধকরি আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়!'—একথা আমার নয়, বলেছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৪৬)।

হ্যাঁ। যে-ব্যক্তি পরলোক-সম্বন্ধে কোনোদিনই আস্থা স্থাপন করতে পারেননি, ভূতের গল্প হলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন অবলীলাক্রমে, তাঁর মুখে এমন ধরনের উক্তি শুনে অবাক্‌ই হতে হয়। 'রাজপথ,' 'দিকশূল,' 'অন্তরাগ,' প্রভৃতি গ্রন্থের যিনি রচয়িতা, 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদনায় যিনি অন্যতম প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকরূপে বাংলা সাহিত্যে নাম করেছিলেন, সেই উপেন্দ্রনাথ প্রেতাত্মার সম্মুখীন হয়েছেন বার বার।

এটা ১৯০২-এর ঘটনা। ভাগলপুর থেকে উপেন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে চলে এসেছেন কলকাতার ভবানীপুরে। কাঁসারিপাড়া রোড়ে একটা বাড়ি

ভাড়া নিয়ে আছেন। ভাদ্র মাস। তালনবমী ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন উপেনবাবুর মা। এই উপলক্ষে কিছু লোককে সেদিন রাত্রে খাওয়ার জন্য নেমন্তন্নও করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত সবাই একে একে আসছেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সবাই তাঁকে 'নাকুবাবু' বলে ডাকে। তিনি এসে রসিয়ে গল্প বলতে শুরু করে দিলেন। তিনি একসময় হঠাৎ বলে বসলেন, জানেন উপীনবাবু, এ-বাড়িতে ভূত আছে। হচ্ছিলো লৌকিক আলোচনা। হঠাৎ অলৌকিক কথায় উপস্থিত কয়েকজন হো-হো করে হেসে উঠলেন। উপেনবাবুও হাসিতে যোগ দিলেন।

উপীনবাবু, হাসা সহজ, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার পর বোধকরি আপনাদের গলার স্বর শুকিয়ে যাবে।—তীক্ষ্ম কটাক্ষ দ্বিজেন্দ্রনাথের।

এক ভদ্রলোক বললেন, বেশ তো, আজই পরীক্ষা করে দেখা যাক। কিন্তু মশাই, আপনিই বা জানলেন কী করে যে এ-বাড়িতে ভূত আছে? কারো কাছে শুনেছেন নাকি?

উষ্মা প্রকাশ করে বললেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, কারো কাছে শুনিনি মশাই, আমার নিজের চোখে দেখা। লালমোহনবাবুরা এ-বাড়িতে আসার আগে আমরাই এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। একমাস দু'মাস নয়, কয়েক বছর কাটিয়েছি এ-বাড়িতে।

লালমোহনবাবু হলেন উপেনবাবুর দাদা। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের বাবা তৎকালীন কলকাতার প্রখ্যাত উকীল করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র ছিলেন। নতুন বাড়ি তৈরি করে করুণাবাবু এ-বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে গেলে উপেনবাবুরা ভাড়া নিয়েছিলেন।

দ্বিজেনবাবুর কথা শুনে একজন বলে উঠলেন, ও, আপনি দেখেননি, শুনেছেন।

কেন, শোনাটা কি কিছুই নয়? সবই দেখতে হবে—এমন কী কথা! আপনি যা শোনেন, সবই কি অবিশ্বাস্য?—বিরক্তি-মিশ্রিত বিস্ময় দ্বিজেনবাবুর মুখে।

আরে মশাই থামুন, অন্য একজন দ্বিজেনবাবুর প্রতিপক্ষকে ধমকে উঠলেন। তারপর দ্বিজেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি বলুন—কি শুনেছেন!

মুহূর্তমাত্র চিন্তা করলেন দ্বিজেনবাবু। তারপর বলতে শুরু করলেন—আমরা ভাড়া নেওয়ার আগে যাঁরা এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন, তাঁদের একটি বছর-চারেকের ছেলে ছিল। সে পড়াশোনা যতটুকু করতো, তার দশগুণ করতো খেলা। আর, মার্বেল ছিল তার একমাত্র খেলার বস্তু। হয় একতলায়, নয় সিঁড়িতে, নয় ছাতে, সব সময় তার মার্বেল গড়ানোর শব্দ শোনা যেত। তার খেলার কোনো সাথী ছিল না। এক পক্ষ সে নিজে আর প্রতিপক্ষ ঐ মার্বেল। একদিন মারা গেল ছেলেটা। কলেরায়। দু'দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চললো। কোনো ডাক্তারই কিছু করতে পারলো না। রাত ঠিক একটায় আমাদের এই ঘরের ওপরের ঘরে সে মারা যায়।—বলে দ্বিজেনবাবু ছাদের দিকে তাকালেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, তারপর থেকে প্রতিদিন রাত্রি ঠিক একটায় ছেলেটি একটিবার মার্বেল ছাড়ে। শক্ত মেঝের ওপর শক্ত মার্বেল পড়ে তিন-চারবার শব্দ করে—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা থ' হয়ে গল্পটা শুনছিলেন। দ্বিজেনবাবু আবার বললেন, না না, অস্পষ্ট নয়। আপনি কান পেতে না থাকলেও সে মার্বেলের শব্দ আপনার কানে যাবেই।

বলেন কি ?

হ্যাঁ। আপনারা যদি শুনতে চান সেই শব্দ, তাহলে আজই রাত একটা পর্যন্ত জেগে এখানে অপেক্ষা করুন। শুনতে পাবেন।

যে ভদ্রলোক ভূত দেখা ও শোনা নিয়ে তর্ক তুলেছিলেন, তিনি আরও কিছু জেরা করতে যাচ্ছিলেন দ্বিজেনবাবুকে। কিন্তু আহারের ডাক পড়াতে সকলেই উঠে পড়লেন।

রাত এগারোটা। বাইরে নিমন্ত্রিত যাঁরা, সবাই খেয়ে-দেয়ে চলে গেছেন। বাড়ির সকলেরও খাওয়া প্রায় শেষ। চাকর-বামুনরা খেতে বসেছে।

উপেনবাবু তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়কে, বললেন, শ্যাম, রাত্রি তো এগারোটা হলো, আর ঘণ্টা দুই পরে সেই মার্বেল খেলা শুরু হবে। আজ রাতটা এখানে থেকে যাও। দ্বিজেনবাবুর কথার সত্যতাটা যাচাই করে ফেলি! বালক-ভূতের মার্বেল খেলা! সুযোগটা

ছাড়া ঠিক হবে না।—উপেনবাবুর কণ্ঠস্বরে একটা তাচ্ছিল্যের আভাস।

শ্যামবাবু বললেন, কিন্তু আমার বাড়িতে যে একটিবার খবর দিয়ে আসতে হবে! নইলে বাড়িতে ভাববে।

অবশ্যই।—বলে উপেনবাবু তাঁর ভাগ্নে সুশীলকে নিয়ে চলে গেলেন কয়েকটা বাড়ির পরে শ্যামবাবুর বাড়িতে। বলে এলেন, আজ রাত্রে শ্যাম আমাদের বাড়িতেই থাকবে। বাড়ি ফিরবে না।

রাত তখন সাড়ে বারোটা। বৈঠকখানায় এসে ফরাসের ওপর বিছানা পেতে শ্যামবাবু ও উপেনবাবু শুয়ে পড়লেন। পরিবেশনে শ্রান্ত হয়ে ভাগ্নে সুশীলচন্দ্রও ঐ ঘরে একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লো।

সুশীলচন্দ্র আরাম-কেদারায় দেহ সমর্পণ করেই গাঢ় ঘুমে নিমগ্ন। নিঃস্তব্ধ বাড়ি। পাড়াও। কেবলমাত্র সুশীলের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আর দেওয়াল-ঘড়ির টিক্-টিক্ আওয়াজ।

শুধু দুটি প্রাণী বিছানায় শুয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বালক-ভূতের মার্বেল খেলার শব্দ শোনার জন্যে। ঢং করে দেওয়াল-ঘড়িতে একটা বাজলো। উৎকর্ণ হলেন দু'জনেই। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দোতলার ঘরে মার্বেল পড়ার শব্দ হলো—ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্! না, অস্পষ্ট নয়, একেবারেই সুস্পষ্ট, সজোর। তারপরই মার্বেলটি গড়াতে আরম্ভ করলো—স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ফরাসের ওপর কে-যেন হঠাৎ বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটিয়ে গেল। উপেনবাবু ও শ্যামবাবু—দু'জনেরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বশরীরে ছম্ করে কাঁটা দিয়ে উঠলো। নড়া-চড়া নেই, যেন দুটি নির্বাক্ নিশ্চল মাটির পুতুল। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না তাও তাঁরা বুঝতে পারছেন না। ভয়টা আরও বাড়িয়ে দিল উপেনবাবুকে অন্য এক চিন্তা এসে। হঠাৎ যদি তিনি দেখেন তক্তাপোশের ধারে-ধারে একটি বছর-চারেকের ছেলে মার্বেল-হাতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে? তাহলে কি করবেন তিনি?

সুশীল সমানে নাক ডাকাচ্ছে। এ-সময়ে যদি একটিবার জেগে উঠতো সুশীল! যদি সে আমাদের সঙ্গে একটিবার কথা বলতো—উপেনবাবুর মনের অবস্থা তখন এমনই।

কিন্তু ওঁদের এ-অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে হলো না। হঠাৎ বাড়ির গেটে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। 'রোকো রোকো' শব্দে উপেনবাবু বুঝতে পারলেন দাদার মক্কেল কিশোরীনাথ ঝা শ্যামবাজার থেকে থিয়েটার দেখে ফিরছেন। কিশোরীবাবু তাঁদের বাড়িতে এসে রয়েছেন দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর একটি কেস নিয়ে শলা-পরামর্শ করার জন্য। উপেনবাবুর মনেই ছিল না যে তিনি আজ থিয়েটার দেখতে গেছেন।

কিশোরীনাথের গলার আওয়াজ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন দু'জন। গেট খুলে দিলেন উপেনবাবু। উৎকট উত্তেজনা থেকে মুক্ত হলেন।

সকাল হতেই দাদাকে বললেন রাতের সব কথা।

দাদা বললেন, এমন কিছু নয়। তবে মেয়েদের কাছে এ-গল্প করো না। ভয় পাবে। এমন মার্বেল পড়ার শব্দ অনেক বাড়িতেই শোনা যায়।

দাদার এই 'এমন কিছু নয়' কিন্তু কয়েক দিন পরেই 'এমন কিছু' হয়ে উঠলো। দাদা লালমোহনের দ্বিতীয় জামাতা কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন শ্বশুর বাড়ি। নাম তাঁর সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ইনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। সেই সুবোধচন্দ্র একদিন রাত দেড়টা নাগাদ তাঁরই শোবার ঘরের দরজার সামনে মার্বেল খেলার আওয়াজ পেলেন।

এত রাত্রে মার্বেল খেলছে কে! —এই মনে করে দরজা খুলেই দেখতে পেলেন, দরজার সামনে একটি ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে ভাবলেন, বোধহয় এই বাড়িরই কোনো ছেলে। পরমুহূর্তে মনে হলো, তাই বা কি করে সম্ভব? এত রাত্রে ঐটুকু ছেলে কি করে একা একা বারান্দায় আসবে? ভয় হলো। অন্য কিছু নয় তো? সাহস করে একবার ডাকলেন ছেলেটিকে—কে তুই? এত রাতে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটি পাশের একটি শিউলি ফুলের ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেঁপে উঠলেন সুবোধচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। মুখে তাঁর রাম নাম।

উপেনবাবুর কথায়ঃ 'সুবোধের অভিজ্ঞতা ও আমাদের অভিজ্ঞতার

দুটি গল্পকে স্বতন্ত্রভাবে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ, একত্রে তত সহজ নয়। দুটি গল্পকে সংযুক্ত করে দেখলে মনে হয়, উভয়ের সমষ্টি থেকে কোনো এক সত্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।'

আরেক দিনের ঘটনা। ১৯৪২-এর অনেক আগের কথা।

পরলোক বিশ্বাস করেন না উপেন্দ্রনাথ। তাঁর যুক্তি হলো, এতদিন চেষ্টাচরিত্র চলেছে, কিন্তু কই, ইহলোক ও পরলোককে যুক্ত করে 'এ-পর্যন্ত তো নির্ভরযোগ্য কোনো সেতু নির্মিত হলো না। যে-উপকরণ অলৌকিককে গড়ে তোলে, বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পাই তার প্রায় ষোলো-আনাই সংস্কার অর্থাৎ কুসংস্কার।' তাঁর মতে, 'ভৌতিক বিবেচনা ভূতের ভয়ের মধ্যে দম আটকে মারা যায়। প্রেতাত্মা বাসা বাঁধে আপন অন্তরাত্মার মধ্যে।'

উপেনবাবুর এ সব যুক্তি, বিশ্লেষণ কোথায় ভেসে যায় যখন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর বলেন, 'যুক্তি-তর্ক আমরা তো জানি, কিন্তু তারপরও যে মনের মধ্যে খানিকটা সংশয় থেকে যায়! যখন আমার এই দেখাকে অবিশ্বাস করতে চাই তখন মনে হয়, এই জীবন্ত চোখদুটো রেখে লাভ কি? এই চোখদুটোই তো ছায়াকে কায়া দেখতে এত ওস্তাদ!'

এ-হেন উপেন্দ্রনাথ তখন ভাগলপুরে ওকালতি করেন।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে রোজ রাতে বসে আড্ডা। আসেন অমরেন্দ্রনাথ দাস। সুকণ্ঠ ও চিত্রশিল্পী মণিবাবু, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। আর আসেন ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। মার্জিত রুচি, মার্জিত কথাবার্তা, সুমার্জিত আচরণ। কিন্তু জমিয়ে আড্ডা দিতে ক্ষিতীশবাবুর জুড়ি নেই।

অনেকেরই জানা আছে, উপেনবাবু হলেন শরৎচন্দ্রের মামা। দুইজনেই প্রায় সমবয়সী। তাই একে অন্যকে নাম ধরেই ডাকতেন। উপেনবাবু ছিলেন সুকণ্ঠ। খুব ভালো গাইতে পারতেন। ফলে এই আড্ডার প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর গান। তাঁর গান আমরাও শুনেছি তাঁর শেষ-জীবনে।

উপেনবাবুর বৈঠকখানায় এই আসর। তাঁর কথায়ঃ 'অমরেন্দ্রনাথ ও আমি সামনা-সামনি বসি, মধ্যে পড়ে থাকে একটা হার্মোনিয়মের ব্যবধান। একমাত্র ক্ষিতীশবাবু ছাড়া আমরা সকলেই ফরাসে বসি। কিছু-

কাল পূর্বে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের ফলে একটা পায়ের শিরায় টান থেকে যাওয়ায় তিনি পা মুড়ে বসতে পারেন না। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বেতের ইজি-চেয়ার ছিল, প্রতিদিন সঙ্গীতপ্রিয় ক্ষিতীশচন্দ্র একটি পায়ের উপর অপর পা স্থাপন ক'রে সেই চেয়ারে উপবেশন ক'রে গান শোনেন, আলাপ-আলোচনা করেন। চেয়ারটি তাঁর জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এমন কি, তিনি উপস্থিত না থাকলেও কেউ সেটা অধিকার করে না, তাঁর অপেক্ষায় খালি পড়ে থাকে।'

একদিন সন্ধ্যায় ক্ষিতীশবাবু রবীন্দ্রনাথের গানের একখানি স্বরলিপির বই হাতে নিয়ে আড্ডায় ঢুকলেন! এসেই উপেনবাবুকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই স্বরলিপি দেখে তুলে নিয়ে আপনাকে গাইতে হবে। গানটির ভাষা ও ভাব আমাকে অস্থির করে রেখেছে। গানটি হলো 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।' গানটি আমি মুখস্থ করে ফেলেছি, কিন্তু স্বরলিপি থেকে গাইবার বিদ্যে আমার নেই।

উপেনবাবু বললেন, এটা আমার পক্ষে কোনো সমস্যা নয়; তবে দুটো দিন সময় চাই। অবশ্যই হাকিমের হুকুম তামিল করবো।

গানটি ভালো করে হার্মোনিয়মে তুলে নিয়ে দুদিন পরের এক আড্ডায় সকলকে শোনালেন উপেন্দ্রনাথ। ক্ষিতীশবাবু আত্মহারা! অন্য সকলেই গান শুনে খুব খুশি! এই গানটির সঞ্চারিতে আছে 'তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে,/সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে?'—এই লাইন দুটি যতবার উপেনবাবু গাইতেন ততবার ক্ষিতীশবাবুর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামতো। এতই তাঁর প্রিয় হয়ে উঠলো তাঁর এই গানটি। এবং প্রত্যেকদিনের আড্ডায় অন্যান্য গানের সঙ্গে এই গানটি গাইতেই হতো উপেন্দ্রনাথকে।

বেশ কয়েকদিন কাটলো। হঠাৎ শোনা গেল ক্ষিতীশবাবু গুরুতর অসুস্থ। ছুটলেন সবাই ডি, এম. ক্ষিতীশবাবুর বাসায়। ব্যাপার কি? ঘোড়ার গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছে। সেই মাথার আঘাতে সমস্ত মুখ জুড়ে বিসর্প রোগ (Erysipelas) দেখা দিল। ডাক্তার-কোবরেজ শত চেষ্টা করেও রোগ সারাতে পারলো না। একদিন রাত দশটায় ক্ষিতীশবাবু মারা গেলেন।

খবর পেয়ে ক্ষিতীশবাবুর দাদা সুরেন্দ্রনাথ সেন এলেন মজঃফরপুর

থেকে। এখানেই ক্ষিতীশবাবুদের পৈতৃক বাড়ি। ক্ষিতীশবাবুর পরিবারকে নিয়ে যাবেন দেশের বাড়িতে।

এঁদের মজঃফরপুরে রওনা দিতে তখনও দিন-চারেক বাকি।

যেদিন তাঁরা রওনা হবেন, তার আগের দিন অমরেন্দ্রনাথ সুরেনবাবুকে বললেন, দেখুন সুরেনবাবু, আপনার মুখ দেখে, আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমাদের কেমন যেন ক্ষিতীশবাবুকে মনে পড়ে। ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা যেমন সন্ধ্যাকালে উপেনবাবুর বৈঠকখানায় বসতাম, আজ সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে তেমনি যদি বসি, তাহলে হয়তো আমাদের মনে হবে, কিছুক্ষণের জন্যে যেন ক্ষিতীশবাবুকেই আমরা ফিরে পেলাম।

সুরেনবাবু রাজি হলেন।—এ তো উত্তম প্রস্তাব। ক্ষিতীশ যে আপনাদের কত আপন ছিল তা আর আমার জানতে বাকি নেই। সে অনেক চিঠিতেই আমাকে আপনাদের কথা লিখতো!

সেদিন চায়ের পর্ব শেষ হতেই অমরেন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন ক্ষিতীশ বাবুর সেই প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতটি গাইতে। হার্মোনিয়ম আনা হলো। গান ধরলেন উপেনবাবু ঃ আমি তোমায় যত—

গান গেয়ে চলেছেন উপেনবাবু তন্ময় হয়ে। উপস্থিত সকলেও চোখ বুজে তন্ময় হয়ে গান শুনছেন। গানের অস্থায়ী অন্তরা শেষ করে সঞ্চারিতে এসেছেন উপেনবাবু—'তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে, / সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?'

হঠাৎ অমরবাবুর কম্পিত মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, উ-পেন -বা-বু-উ—

'আমি উত্তর দিলাম, হুঁ! অর্থাৎ আমিও দেখেছি। দেখেছি ঘরের নৈর্ঋত কোণে রক্ষিত বেতের ইজি-চেয়ারের উপর কখন সশরীরে এসে নিঃশব্দে বসেছেন ক্ষিতিশচন্দ্র,—এক লহমার জন্য অবশ্য—কিন্তু সেজন্য সাদৃশ্যবোধের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি—একেবারে সুস্পষ্ট, কঠিন, নিটোল ক্ষিতীশচন্দ্র। ছায়া নয়, মায়া নয়—ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়। তেমনি আগেকার মত পায়ের ওপর পা দিয়ে, ডান হাতের ছড়িটা পায়ের ওপর রেখে আমাদের ওপর দৃষ্টিপাত করে মৃদু মৃদু হাসছেন। 'সশরীরে প্রকাশ' বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহলে একান্তভাবে তাই।'

এদিকে ফরাসের ওপর আড় হয়ে পড়ে মতিবাবু হাত-পা খিঁচতে

শুরু করেছেন। প্রেমসুন্দর বসুও ঘটনার অলৌকিকতায় স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন। সবাই দেখেছেন ক্ষিতীশবাবুকে। দেখেননি শুধু সুরেনবাবু।

মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা কি? সেই তো ঘুরে-ফিরে এই কথায় আসতে হয়ঃ যখন আমার এই দেখাকে অবিশ্বাস করতে চাই তখন মনে হয়, এই জীবন্ত চোখ দুটো রেখে লাভ কি? এই চোখ দুটোই তো ছায়াকে কায়া দেখতে ওস্তাদ।

আরো একদিনের ঘটনা। তখন উপেনবাবুরা বাস করছেন পূর্ণিয়ায়। উপেনবাবুর মা দুটি যমজ কন্যা প্রসব করেছেন। তারপরেই তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগলো। পূর্ণিয়ার ডাক্তারেরা মায়ের স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি ঘটাতে পারলেন না।

অগত্যা পূর্ণিয়া থেকে মাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে ভাগলপুরে আনা হলো। শুধু বায়ু পরিবর্তনই নয়, ভালো ডাক্তার দেখানোও অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিন্তু সদ্যোজাত যমজ কন্যা দুটির কি হবে?

তারও ব্যবস্থা করলেন উপেনবাবুর মেজদা রমণীবাবু। একজন দুগ্ধবতী মহিলাকে রাখা হলো যমজ কন্যা দুটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

কিছুকাল ভাগলপুরে থেকে উপেনবাবুর মায়ের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। মেজ ছেলের সঙ্গে তিনি পুনরায় পূর্ণিয়ায় ফিরে চলেছেন। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে প্রায় সমস্ত রাতটাই কাটাতে হবে। ভোর চারটেয় গাড়ি। সেই গাড়িতে এসে সকরিঘাটে নামতে হবে। তারপর গঙ্গা পার হতে হবে স্টীমারে। এরপর মণিহারী ঘাটে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হবে পূর্ণিয়ার।

অতএব সাহেবগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে আশ্রয় নিলেন উপেনবাবুর মা আর মেজদা। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

রাত তখন বারোটা। হঠাৎ মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই মেজ ছেলে রমণীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন।

কি হয়েছে মা?—ছেলের নিদ্রাজড়িত জিজ্ঞাসা।

মা তখনও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন এক অজানা আতঙ্কে।—তুই কি কাউকে এখানে আসতে দেখেছিস?

না তো মা! আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল।

কান্নায় আটকে যাচ্ছে মায়ের কণ্ঠস্বর। বললেন, রমণী, আমার বড় খুকি মারা গেছে।

সে কি? তুমি কি করে জানলে?—বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ রমণীর।

আমি দেখলাম, বড় খুকি এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আধো আধো স্বরে বললো, মা আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

এই বড় খুকি হলো যমজ কন্যা দুটির বড়টি।

রমণীবাবু বললেন, না না, এ সত্যি নয়, তুমি স্বপ্নে এসব দেখেছো। হয়তো এদের চিন্তা করছিলে শোবার আগে, তাই—

মা সবেগে মাথা নাড়লেন, না না, এ স্বপ্ন নয়। আমি একটুও ঘুমুইনি। আমি জেগেই তাকে দেখেছি। তুই বিশ্বাস কর্ রমণী, সে বললো, মা আমি তোমার বড় খুকি! আমি এখনই মারা গেলাম।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো রমণীবাবুর।

কাঁদতে লাগলেন মা।—আমায় কিছু জিজ্ঞেস করার সময় দিলে না। কথা কটি বলেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মায়ের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা চিন্তা করে রমণীবাবু আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। চুপ করে গেলেন।

রাতটা কোনো রকমে এই ভাবেই কাটলো। তারপর ট্রেন এলে ভারাক্রান্ত মনে ট্রেনে উঠে বসলেন।

পরের দিনই এঁরা বেলা দশটার ট্রেনে এসে পেঁছিলেন পূর্ণিয়া স্টেশনে।

স্টেশন থেকে ওঁদের বাড়ি ভাড়ায় যাবার পথে মাঝখানটায় ক্যাপ্টেন-ঘাটের পুল। পুলের ঠিক নিচেই পূর্ণিয়ার শ্মশানঘাট। পুলের ওপর দিয়ে যাবার সময় মা তাকালেন শ্মশানের দিকে। তাঁদের চেনাশোনা কেউ কি এসেছে বড় খুকিকে নিয়ে! পোড়াতে!

মায়ের মন! বড় খুকির মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

বাড়িতে পেঁছে যে-সংবাদ এঁরা পেলেন তা মর্মান্তিক। মায়ের কথাই সত্যি। কাল রাত বারোটার সময়ে হঠাৎ ভেদবমি হয়ে বড় খুকি মারা গেছে। বিশেষ কোনো অসুখ-বিসুখ নয়। হঠাৎই মৃত্যু।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। মেজ ছেলে রমণীবাবু নির্বাক্-নিস্পন্দ।

যুক্তিবাদী ও অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবার কিন্তু হার মেনেছেন তাঁর বিশ্বাসের কাছে ঃ 'আমাদের সহজ সাধারণ বিবেচনা ও বিচারশক্তির দ্বারা এ-ঘটনার যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখতে গেলে সহজেই হয়তো এমন কয়েকটি দুর্বল স্থান অনুভব করা যাবে যার ওপর রীতিমত জেরা চালানো সম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, ভৌতিক কল্পনা যদি আদৌ ভুলই হয়, তাহলে ইহলোকের বুদ্ধি-বিচার-ধারণা-বিবেচনার মাপকাঠি দিয়ে সেকথা প্রমাণ করতে যাওয়াও ভুল হবে।··· প্রথমত সাহেবগঞ্জে মাতাঠাকুরাণী কর্তৃক বড় খুকির মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন, দ্বিতীয়তঃ, ঠিক সেই একই সময়ে পূর্ণিয়ায় বড় খুকির মৃত্যু। কোনো লৌকিক কৈফিয়তের দ্বারা এমন অলৌকিক ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন বোধকরি আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়।'

মাদাম ব্লাভাৎস্কি যখন তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখালেন

সেদিন বোম্বের এক ঘরে বসে রাশিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া ব্রহ্মবিদ্ মাদাম ব্লাভাৎস্কি (১৮৩১-১৮৯১) আলাপ করছেন শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)-এর সঙ্গে। শিশিরকুমার তখন জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন না, আর মাদাম জন্মান্তরে বিশ্বাসী। মাদাম এবং কর্নেল অলকট (১৭৯৯-১৮৮৮) এসেছেন ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করতে। ওঁদের মত ঃ ভারতবর্ষ হলো যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান। অথচ এ-সম্বন্ধে ভারতবাসী অসম্ভব রকমের উদাসীন। অবহেলায় এবং আলোচনার অভাবে যোগবিদ্যা বিলুপ্ত হতে বসেছে ভারতবর্ষ থেকে। তার পুনরুজ্জীবনের জন্যেই এই দুই মনীষী এখানে এসেছেন। প্রতিষ্ঠা করছেন 'থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি' বা 'ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি'।

শিশিরবাবু বললেন, বেশ আপনাকে আমি সাহায্য করবো।

মাদাম বললেন, কলকাতায় 'ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি' প্রতিষ্ঠায় আপনি সাহায্য করুন।

শিশিরকুমারের প্রচেষ্টায় কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, যশোহরের চাঁচড়ার রাজা বরদাকান্ত রায় প্রমুখ বিত্তশালী ব্যক্তি মাদামের 'ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি'তে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'। শিশিরবাবু দশ টাকা দিয়ে ঐ সমিতির প্রথম সদস্য হলেন। তিনি লিখেছেন : I was I believe, the first member of the Society. (দ্র. Hindu Spiritual Magazine, vol. III, pt. II, p. 426),

কিন্তু তাঁর সংশয় থেকে গেল, ব্রহ্মবিদ্যা আর জন্মান্তরবাদ কি এক ? একটার সঙ্গে অন্যটা মেলাবেন কি করে মাদাম ? তাই বললেন, আপনার জন্মান্তর বিশ্বাস, ভারতবর্ষে আপনার প্রবর্তিত ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের অন্তরায় হবে।

কেন ? --মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি যদি ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহলে আপনাদের সমিতির উন্নতি হবে বলে মনে হয় না।

কারণ কি ?—আবার মাদামের জিজ্ঞাসা।

কারণ, 'মৃত্যু' বলতেই মানুষের মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়, তা প্রেতাত্মবাদ দ্বারা দূর হয়। কিন্তু আপনি যদি ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে জন্মান্তরবাদ সংযোগ করেন, তাহলে মানুষ কিন্তু প্রেতাত্মবাদই গ্রহণ করবে, ব্রহ্মবিদ্যা নয়।

মাদাম বললেন, মৃত্যুর পরে যে আত্মা বিদ্যমান থাকে, আত্মার যে মৃত্যু নেই—একথা তো আমরা বিশ্বাস করি !

শিশিরকুমারের উত্তর : পূর্বজন্মে বিশ্বাস দ্বারা মানুষের মৃত্যুভয় কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। আপনি ব্যাপারটা বুঝুন, মানুষ যদি বুঝতে পারে, মৃত্যু একটা পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয় এবং এই পরিবর্তন হলেও তারা পরলোকে গিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, তাহলে তার মৃত্যুকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। সে মনে করবে মৃত্যু তো একটা পরিবর্তন মাত্র, এতে ভয়ের কি ? কিন্তু মানুষ যদি জন্মান্তরবাদী হয়, তাহলে তার মৃত্যুভয় দূর হবে কেমন করে ? সে ভাববে, মৃত্যুর পরে তার

স্বরূপত্ব ধ্বংস হবে, তার স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না—এসব চিন্তা তাকে ভীত করে তুলবে।

মাদাম শিশিরকুমারের এ-যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। শুধু বললেন, তুমি হিন্দু, কিন্তু জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস কর না?

সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের উত্তর ঃ হ্যাঁ, বর্তমানে হিন্দুরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে থাকেন বটে, কিন্তু আপনি কি জানেন, এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত নয়!

তবে?—মাদামের জিজ্ঞাসা।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাস্ত্রকারই এই জন্মান্তরবাদের প্রবর্তক।

প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ, বেদ। মানুষ মৃত্যুর পর পরজগতে বর্তমান থাকে—একথাই বেদে প্রচারিত। আমাদের অধ্যাত্মবাদও এই মত অনুসরণ করে।

শিশিরকুমারের এ-কথায়ও মাদাম ব্লাভাৎস্কির মনটা সায় দেয় না। হয়তো শিশিরকুমারের প্রতি রুষ্টও হয়েছিলেন সেদিন।

শিশিরকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, তাহলে আমার এক বোনকে যেদিন মেসমেরাইজ করেছিলাম, সেদিনের সেই ঘটনাটি কি মিথ্যে?

'মেস্‌মেরিজম্' (মোহিনীবিদ্যা) কথাটির উৎপত্তি কোথায়?

কেন, ফ্রান্সে মিস্টার মেসমার (Mesmer)-ই তো প্রথম এই বিদ্যার প্রচারক। তাই তো মেসমারের নাম থেকে 'মেসমেরিজম্' শব্দের উৎপত্তি। মেসমেরিজম্ আর হিপনোটিজম্ তো একই!

এ-বিদ্যা ভালো ভাবে শিক্ষা করেছিলেন শিশিরকুমার। আর এ-বিদ্যা ব্যবহার করতেন তাঁর এক বোনের ওপর।

সেই বোনকে সেদিনও মেসমেরাইজ করলেন। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন একটু বেশি সময় ধরে করলেন।

বোন ঘুমিয়ে পড়লো।

শিশিরকুমার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঘুমচ্ছো?

কোনো জবাব নেই। আবার প্রশ্ন ঃ তুমি কি ঘুমচ্ছো? উত্তর দাও।

এবারও নিরুত্তর বোন।

ভয় পেয়ে গেলেন শিশিরকুমার। এমন তো এর আগে কোনো দিন

হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেতেন। কিন্তু আজ? এমন হচ্ছে কেন? আর্তচিত্তে নাড়ি টিপে দেখলেন তিনি। সর্বনাশ! একেবারেই স্পন্দন নেই নাড়িতে। বুকে হাত দিয়ে দেখলেন—না, সেখানটাও নিঃস্পন্দ! এখন উপায়?

তবুও অধীর হলেন না তিনি। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঘুমিয়েছ? যাতে বোনের চৈতন্য ফিরে আসে আপ্রাণ তার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

এ-ভাবে আরও কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর হঠাৎ উত্তর হলোঃ আমি মরেছি।

মরেছ?—শিউরে উঠলেন শিশিরকুমার। ভয়ার্ত কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমি মরেছি। আমার আত্মা ঐ দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে আসে, আমি এখন সেখানেই আছি।

এবার অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন শিশিরকুমার। কি বলবেন লোকদের? তাঁরই জন্যে তো বোনটি মারা গেল!

অনুনয় করে বললেন তিনি, তুমি তোমার মৃতদেহে ফিরে এসো!

অস্বীকার করলো বোনের আত্মাঃ আমাকে ফিরে আসার কথা কেন বলছো? মৃত্যু মানুষের একটা পরিবর্তন ছাড়া তো আর কিছু নয়। আমি এ-পরিবর্তন চাই।

ব্যথিত চিত্তে শিশিরকুমার বললেন, তুমি যা বলছো, তা হয়তো সত্যি, কিন্তু আমার অবস্থাটা কি বুঝতে পারছো না? তুমি ছেড়ে গেলে যে আমরা—কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো তাঁর। একটা অজানা আতঙ্কে প্রশ্বাস বেরিয়ে আসতে গিয়ে যেন গলায় আটকে গেল।

উত্তর হলোঃ আমি যেখানে এসেছি সেখানটা পৃথিবী থেকে সুন্দর। আমি অতি সহজেই এখানে এসেছি। তুমি আমাকে কত ভালোবাসো, তবে স্বার্থপরের মতো আবার দুঃখময় জগতে ফিরে যেতে বলছো কেন সেজদা?

শিশিরকুমার বোনের উত্তর শুনে কাঁদতে লাগলেন। শেষে বললেন, তুমি যদি ফিরে না এসো, তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

একথা শুনে আত্মা আবার মৃত শরীরে ফিরে আসতে রাজি হলো। ধীরে ধীরে বোনের শ্বাশ-প্রশ্বাসের কাজ আরম্ভ হলো এবং চৈতন্য লাভ করলো।

এ-ঘটনার লেখক অনাথনাথ বসু (১৯০০-১৯৪৬) বললেন, 'শিশির-কুমারের জীবনকথা সংগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার এই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে অনেক কথার পর তিনি সজল নয়নে বলিয়াছিলেন, আমাদের সেজদাদার কথা কি বলিব? তিনি আমাকে স্বর্গ দেখাইয়া-ছিলেন।'

তবে বোনের সেই আত্মার উক্তি—'মৃত্যু মানুষের একটা পরিবর্তন ছাড়া তো আর কিছু নয়'—এটা কি মিথ্যে?

সেদিন তাই ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে তর্ক আর বাড়াননি শিশিরকুমার!

একদিন অলকট্ সাহেবকে বলেছিলেন তিনি, মাদামের অলৌকিক শক্তি আমাকে দেখাতে পারেন?

পারি বই কি!—কর্নেল অলকট্ বললেন, মাদাম নিজের শরীর পরি-ত্যাগ করে কিংবা সশরীরে ইচ্ছামতো নানা স্থানে বেড়াতে পারেন। ইচ্ছা মতো লোকচক্ষুর বাইরেও যেতে পারেন। আপনার ইচ্ছা মাদামকে জানাবো আমি।

একদিন শিশিরকুমারের ইচ্ছার কথা কর্নেল জানালেন মাদামকে। বললেন, শিশিরকুমার আপনার কাছ থেকে কিছু অলৌকিক ঘটনা না দেখলে আপনার ওপর বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কথা শুনে হাসলেন মাদাম। কোনো কথারই উত্তর দিলেন না।

বোম্বের যে-বাংলোয় শিশিরকুমার আর অলকট্ বাস করছেন তার অনেক দূরে অন্য একটি বাড়িতে বাসা নিয়েছেন মাদাম ব্লাভাৎস্কি।

একদিন বাংলোর বারান্দায় বসে গল্প করছেন অলকট্ আর শিশির-কুমার। অলকটের খালি-গা। গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে যখন প্রবেশ করলো একটি লোক। মাদামের ভৃত্য। তার হাতে একটি কাগজ। কাগজটি অলকটের হাতে দিয়ে সে চলে গেল।

কাগজের লেখাটি পড়েই অলকট্ উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটি জামা পরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন।

শিশিরকুমার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? হঠাৎ জামা পরতে গেলেন কেন?

মাদাম জানিয়েছেন, খালি গায়ে থাকাটা অসভ্যতা।—বলে চিঠির কাগজটা শিশিরকুমারের হাতে তুলে দিলেন কর্নেল।

শিশিরকুমার চিঠি পড়ে অবাক্!—ওখান থেকে তিনি কি করে দেখলেন যে আপনি খালি গায়ে আছেন?

হাসলেন অলকট্।—সব দেখতে পান মাদাম। এইটাই তাঁর অলৌকিকত্ব।

অন্য আর একদিন।

সকালবেলা প্রাতরাশে বসেছেন অলকট্, মিস্টার উইনব্রিজ, মিসেস বেট্স্ এবং শিশিরকুমার।

হঠাৎ মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন তাঁরা। ঘরের মধ্যে।

চমকে উঠলেন শিশিরকুমার। বললেন, কে বাজাচ্ছে ঘণ্টা? ঘরে তো অন্য কেউ নেই।

অলকট্ বললেন, মাদাম। বোধ হয় তোমার জন্যেই।

কোথায় তিনি?—সকৌতুক প্রশ্ন শিশিরকুমারের।

তিনি তাঁর বাড়িতেই। এটা অলৌকিক শক্তি।

বিস্মিত শিশিরকুমার সঙ্গে সঙ্গে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। সোজা ঘোড়ার গাড়ি চেপে মাদামের বাড়ি। দেখবেন তিনি সত্যি বাড়ি আছেন কিনা, কিংবা ঘণ্টাধ্বনির কথা তিনি জানেন কিনা।

সিঁড়িতে উঠতেই মাদাম এলেন এগিয়ে। বললেন, আমি জানতাম, তুমি তোমার খাবার ঘরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে এখনই ছুটে আসবে আমার কাছে। এই দেখ সেই ঘণ্টা, বলে টেবিলের ওপর থেকে একটা ঘণ্টা এনে বাজালেন। অবিকল সেই শব্দ। বললেন মাদাম, এখানে আমি যে শব্দ করবো তুমি কলকাতায় থাকলেও তা শুনতে পাবে।

মাদামের কথায় বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বিলম্ব হলো না শিশিরকুমারের।

মাদাম বললেন, তুমি আমার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখতে চেয়েছিলে না?

শিশিরকুমারের মাদামকে মনে হলো, তিনি মানবী নন, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্না কোনো দেবী।

সাংবাদিক নীরেন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বলতেন

তাঁর মেয়ের প্রেতাত্মা

সাংবাদিক নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রথমে ছিলেন রয়টার্স এজেন্সির কলকাতা শাখায়। পরে এলাহাবাদে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। যেমন আলাপী-মিশুকে, তেমনি কর্মদক্ষ। পড়াশোনাও তাঁর অগাধ।

তাঁরই কন্যা মঞ্জরী। ডাকনাম ফুটু। খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। শান্তিনিকেতনেও কিছুদিন কাটিয়েছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা অর্থাৎ ফাইন আর্টসের সব বিভাগেই তিনি সমান আগ্রহী। ১৯৪৬-এ বিয়ে হলো এলাহাবাদে। এক বছর ঘুরে না যেতেই মঞ্জরী মারা গেলেন।

কন্যার অকাল-বিয়োগে নীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ভেঙে পড়লেন। শোকাচ্ছন্ন মা-বাবা সব সময় মঞ্জরীর চিন্তায় বিভোর থাকেন। জন্ম হলেই মৃত্যু—এই স্বাভাবিক চিন্তা কখনো কখনো মায়ের মনে সান্ত্বনার আশ্বাস নিয়ে এলেও মায়ের প্রাণ কোনো কিছুরই বাধা মানে না। আর

এ-তো অকাল-মৃত্যু, জামাই রবির মুখের দিকেও তিনি তাকাতে পারেন না। ফুল না ফুটতেই ঝরে গেল অকালে—এ শোকের আশ্রয় কোথায়? একটি বার মঞ্জরীকে দেখা যায় না? যায়। কিন্তু কীভাবে?

নীরেনবাবু বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনেছেন প্লানচেটের কথা। জেনেছেন মৃত আত্মাকে আনানো যায় প্লানচেটের মাধ্যমে। কথা বলা যায় প্রেতাত্মার সঙ্গে, কিন্তু তাকে সশরীরে দেখা যায় কি? গলা শোনা যায় কি প্লানচেটে?

সবাই বললেন, বোধ হয় না। আপনি যা জিজ্ঞেস করবেন, কেবল তারই উত্তর পাওয়া যায় মিডিয়মের দ্বারা লেখার মারফৎ।

তাই বা কম কিসে? নীরেনবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, দেখি চেষ্টা করে যদি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি। হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পাবে।

সেই ব্যবস্থাই হলো। মঞ্জরীর মৃত্যুর দিন-ষোলো পরে প্লানচেটে বসলেন নীরেনবাবু। সঙ্গে স্ত্রী। মেয়েকে দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহ। শুধু সংশয়ের দোলা: ওকি আর আসবে? দেখা দেবে কি আমাকে? দুজনেই ধ্যান করছেন মঞ্জরীর মুখ।

মায়ের হাতে কাগজ-পেনসিল।

এক সময়ে নীরেনবাবু বুঝতে পারলেন, পরলোকের আত্মা ভর করেছে স্ত্রীর দেহে। জিজ্ঞেস করলেন নীরেনবাবু, তুমি কে?

একবারেই উত্তর হলো: আমি তোমাদের মেয়ে মঞ্জরী। তোমাদের আদরের ফুটু।

অধীর হলেন নীরেনবাবু। বললেন, তোর মা তোকে ছেড়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে। তুই একটিবারের জন্যে দেখা দে তোর মাকে।

দেব। তবে ঠিক রাত তিনটেয়। মাকে জেগে থাকতে বলো, আমি আসবো।

সেদিন রাতে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন মা। কখন রাত তিনটে বাজে। ঘরে মৃদু আলো।

নীরেনবাবু হাতঘড়ি দেখেন। আর মাত্র দু'মিনিট।

বন্ধ ঘরে ঠিক তিনটেয় একটা আলো এসে সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। সকলের চোখ পড়লো সে-দিকে। ঠিক যেন প্রদীপ জ্বলেই নিভে যাওয়া।

পরমুহূর্তে আবার একটি গোল আলোর বৃত্ত জ্বলে উঠলো ঘরের

মধ্যে। আলোর বৃত্তটি ঘুরতে ঘুরতে স্থির হয়ে গেল দেয়ালে টাঙানো মঞ্জরীর ফোটোর ওপর। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই অদৃশ্য হলো আলো। এই কয়েক সেকেন্ডে দেখা গেল মঞ্জরীর ফোটোটি যেন জীবন্ত, উজ্জ্বল। বুঝলেন, আত্মা জ্যোতির্ময়। এ-আলো মঞ্জরীর আত্মার।

মৃত মঞ্জরীর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ যেন দিন-দিন বেড়েই চলেছে মায়ের।

শুধু মা-ই বা কেন? মঞ্জরীর স্বামী রবিবাবুরও আগ্রহ কি কম?

সেদিন সন্ধেবেলা। নীরেনবাবুর স্ত্রী বললেন, আমার পান গেছে ফুরিয়ে। এখন কি করা যায় বলো তো!

নীরেনবাবু প্রমাদ গুনলেন, সর্বনাশ! এই রাতে বাজারে ছুটতে হবে। বললেন, বাজার তো অনেক দূর। কোনোরকমে রাতটা চালিয়ে দাও। কাল সকালে দেখা যাবে। বলে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না নীরেনবাবু। স্ত্রীর পানের নেশা। মনটা যেন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো।

এমন সময় জামাই এলেন ঘরে। হাতে তাঁর এক গোছা পান।

নীরেনবাবু বললেন, কী ব্যাপার? এ-সময়ে? হাতে পান দেখে বললেন, পান কেন?

জামাই উত্তর দিলেন, ও যে বললে!

কে বললে? কী বললে?—বিস্ময়ের শেষ সীমায় নীরেনবাবু।

জামাই বললেন, অফিস ছুটি হতেই সবাই একে-একে চলে গেল। দেখলাম ফাঁকা অফিস। প্লানচেটে বসে ডাকলাম ফুটুকে। ও এলো। বললাম, তুমিই যে ফুটু জানবো কি করে? প্রমাণ দাও। উত্তর পেলাম, মায়ের পান ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি যাওয়ার সময় পান কিনে নিয়ে যেয়ো। তাই নিয়ে এলাম।

সবাই অবাক্।

এঁরা যখন প্লানচেট নিয়ে বসতেন, রোজই কিন্তু একজনের আত্মাই আনতেন না। প্রধানত আদরের ফুটুকে ডাকলেও এঁরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এমন কি রবীন্দ্রনাথের আত্মাকেও ডাকতেন! এঁরা সবাই নীরেন-বাবুর প্লানচেটে আসতেন। কখনও ভিন্ন-ভিন্ন দিনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়েও এই বৈঠকে বসা হতো। তাতে সুফল ফলতো।

কখনো দু'জন, কখনও তিনজন, আবার কখনো একাও প্লানচেটে বসতেন।

নীরেনবাবুর স্ত্রী একদিন বসে মঞ্জরীকে ডাকলেন।

মেয়ে এলো।

বললেন, তুমি যে সত্যিই এসেছো, তার একটা চিহ্ন রাখবে?

উত্তর হলো, হ্যাঁ রাখবো।

কি চিহ্ন?—মায়ের প্রশ্ন।

কুটুর আত্মা উত্তর দিলে, কেন, রেখেছি তো মা!

কোথায়?

তোমার হাতের কাগজটা উল্টে দেখ, একটা সিঁদুরের দাগ দেখতে পাবে। ওটা তো আমিই দিয়ে রেখেছি।

তখনি পাতাটি উল্‌টে দেখলেন মা। কাগজের এক কোণে একটি সিঁদুরের ফোঁটা!

এমনি ভাবে অনেক দিন ধরে চলেছিল মৃত মঞ্জরীর আত্মার সঙ্গে মা-বাবা-স্বামীর কথাবার্তা কওয়া। মনের অনেক শোক ভুলে গিয়েছিলেন এঁরা। এটাই তো নীরেনবাবুর পরিবারের পরম পাওয়া।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্লানচেটে এসে যে-কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন তা মৃত মঞ্জরীকে নিয়েই। এঁরা অবাক্ হয়ে ভাবতেন, তাহলে কবির কাছেও কি মঞ্জরীর মৃত্যু অজ্ঞাত নয়? সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

মঞ্জরী তুমি ফোটার আগেই
ঝরিয়া পড়িলে হায়,
তব প্রিয়জন কাঁদিয়া আকুল
ফিরিয়া দেখনি তায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আত্মা জানিয়েছে: দেশ চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু তাতে কি লাভ হয়েছে তোমাদের? এতে ক্যাপিটালিস্টদের সুবর্ণ সুযোগ এসেছে কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর কি লাভ হয়েছে?

নীরেনবাবুর এ-সব দেখে মনে হয়েছে, ইহজগতে যে-যেমন চিন্তা নিয়ে বেঁচে ছিলেন, পরলোকে গিয়েও তাঁদের আত্মা একই প্রকার চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকে।

বোনের জন্য ভাইয়ের প্রেতাত্মা ওষুধ বলে দিয়েছিল

কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনগুপ্তকে

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্যামাচরণ সেনগুপ্তের নাম বাংলাদেশে অজানা নয়। তাঁর রচিত প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম 'আয়ুর্বেদার্থচন্দ্রিকা'। কবিরাজ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সে-যুগে অনন্যসাধারণ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তাঁর ডাক আসতো রোগী দেখার জন্যে। যে-কোনো রোগে তাঁর ওষুধ ছিল ধন্বন্তরীস্বরূপ। তিনি দূর গ্রামে রোগী দেখতে যেতেন তাঁর পোষা ঘোড়ার পিঠে চড়ে। কিন্তু একবার যে তাঁকে হার মানতে হয়েছে তাঁরই রোগী বিপিনের প্রেতাত্মার কাছে!

তাঁর নিবাস ভাজনঘাট থেকে বেশ কয়েকমাইল দূরে সেদিন তিনি রোগী দেখতে গেছেন ঘোড়ায় চড়ে। দুপুর হয়ে গেছে রোগীর বাড়ি পৌঁছুতে। গ্রীষ্মের দুপুর। প্রচণ্ড রোদে অবসন্নপ্রায়। তবুও কর্তব্যে অবহেলা তো করা যাবে না!

রোগীর কাছে গিয়ে প্রথমে নাড়ি পরীক্ষা করলেন। তারপর রোগীর বাবা-মায়ের কাছে রোগের বৃত্তান্ত সব শুনলেন।

রোগীর নাম বিপিন। বয়স তেরো-চৌদ্দ। প্রায় একসপ্তাহ যাবত রক্ত-পায়খানা করছে বিপিন।

কবিরাজ শ্যামাচরণবাবু প্রথমে লক্ষণ মিলিয়ে নিয়ে রক্ত-আমাশয়ের ওষুধ দিলেন। বললেন, এর উপকারিতা বুঝতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগবে। আমি পাশের গ্রাম থেকে ততক্ষণ অন্য একটি রোগী দেখে আসি।

কেঁদে উঠলেন রোগীর মা।—আপনি দয়া করে এখন চলে যাবেন না কবিরাজমশাই! একটুখানি অপেক্ষা করে রোগীর ভাবটা দেখে যান।

বাবা বললেন, তাছাড়া এই ভর দুপুরে তো আপনাকে না খাইয়ে যেতে দেবো না কবিরাজমশাই। রোগী দেখলেন, ওষুধ দিলেন, এখন একটু বিশ্রাম করুন। আপনার আহারের ব্যবস্থা করছি।

অগত্যা তাই মেনে নিলেন শ্যামাচরণবাবু! ঠিক আছে, খাওয়া-দাওয়া করে উঠবার পর রোগীর অবস্থা বুঝতে পারবো।

কিন্তু না। বিপিনের অবস্থা ভালো হলো না। প্রতিনিয়ত পেট দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে পায়খানার সঙ্গে।

কবিরাজ অন্য ওষুধ দিলেন। তাতেও কাজ হলো না। আবার ওষুধ বদলে দিলেন। কিছুতেই কিছু হলো না।

সন্ধে গড়িয়ে রাত হলো। কবিরাজ শ্যামাচরণ ঠায় বসে রুগ্ণ বিপিনের শয্যার পাশে। সেদিন আর বাড়ি ফেরা হলো না।

রাত তিনটের সময়ে হঠাৎ মারা গেল বিপিন।

সারা বাড়িতে কান্নার রোল উঠলো!

বিফলতার ক্ষোভ আর দুঃখ নিয়ে সকালে বাড়ি ফিরলেন শ্যামাচরণ ঘোড়ায় চেপে।

এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরে, সকাল বেলায়, মৃত বিপিনের বাবা আবার এলেন কবিরাজ শ্যামাচরণবাবুকে ডাকতে!—আমার একমাত্র কন্যা শৈল খুবই অসুস্থ। এখনি একবার যেতে হবে আপনাকে।

কবিরাজমশাই ঘোড়ায় চেপে আবার সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। শৈল খুবই অসুস্থ। রোগ সেই এক। শৈলর বয়স প্রায় আট-নয়। বিপিনের ছোট বোন।

লক্ষণ দেখে বললেন, বিপিনের রোগের মতো একই রোগ। আমি সারাতে পারবো না। এ-রোগের ওষুধ আমার জানা নেই!

তাহলে আমাদের কি হবে কবিরাজমশাই?—কেঁদে আকুল শৈলর মা-বাবা।—শৈলকে আমরা বাঁচাতে পারবো না?

চিন্তিত স্বরে বললেন কবিরাজমশাই, অন্য ডাক্তার দেখান। আমার কিছুই করার নেই।—ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখেন, যেখানে ঘোড়াটি বেঁধে রেখেছিলেন সেখানে ঘোড়া নেই!

ঘোড়া কোথায়? অবাক কাণ্ড! এখানেই তো বাঁধা ছিল!—চারিদিকে তাকাতে থাকেন কবিরাজমশাই। নাঃ, কোথাও তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

পাশের বাড়ির একজন লোক ছুটলো ঘোড়ার খোঁজে। কবিরাজ বলে দিলেন, তুমি আমার বাড়ির রাস্তার দিকে যাও। বোধহয় ও পালিয়েছে বাড়ির দিকে।—ব'লে তিনি নিজে গেলেন বিপরীত রাস্তায়। বলা তো যায় না—কোন্ দিকে ঘাস খেতে-খেতে চলে গেছে।

কবিরাজ বেশ কিছুদূর চলে গেছেন। একটা মাঠ ছাড়িয়েছেন, তারপর ছাড়ালেন একটা আম-জাম-কাঁঠালের বাগান।

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো ঐ বাগানের মধ্যে থেকে কে-যেন তাড়িয়ে ঘোড়াটিকে নিয়ে আসছে ভরা দুপুর। বাগানের আলোছায়ার মধ্যে কোনো মানুষকেই তো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

তবে? ঘোড়াটি এমন ভাবে দুল্কি চালে ছুটছে যেন মনে হচ্ছে কারো নির্দেশে বাগান থেকে পথে বেরিয়ে এলো ঘোড়াটি।

কবিরাজমশাইয়ের সামনে আসতেই ঘোড়াটি থেমে গেল। মনে হলো যেন কেউ তাঁর সামনে এসে ঘোড়াটিকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ ঘোড়াটিকে ধরে ফেললেন।

হঠাৎ রাস্তার পাশেই তাঁর সামনে জাম গাছটার কাছাকাছি একটি যুবকের কণ্ঠস্বর শুনলেন কবিরাজমশাই।—আপনার ঘোড়া আমিই ধরে এনেছি!

আচম্কা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে জাম গাছটার দিকে তাকালেন কবিরাজমশাই। দুপুরের রোদ। ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিন্তু কই, কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না! ভাবলেন, হয়তো মনের ভুল।

না, ভুল শোনা নয়। আবার সেই কণ্ঠস্বর—আপনার বাড়ি যেতে কষ্ট হবে, তাই ঘোড়াটিকে ধরে এনেছি।

এবার কবিরাজের রূঢ় কণ্ঠস্বর—কে তুমি? কে ঘোড়া খুঁজে এনেছো?

আমি বিপিন! সেই—যাকে আপনি বাঁচাতে পারেননি, সেই বিপিন।

নামটি শুনেই কবিরাজমশাইয়ের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো ভয়ে। একটা অজানা আতঙ্ক যেন দলা পাকিয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে ব্রহ্ম-তালুতে গিয়ে উঠছে। কাঠ হয়ে গেছেন কবিরাজমশাই।

অভয় দিল বিপিনের প্রেতাত্মা—ভয় নেই আপনার! আপনার কোনো ক্ষতি করবো না আমি। আমার একটা অনুরোধ কবিরাজমশাই, আদরের বোন শৈলকে আপনি বাঁচান।

কিন্তু তুমি তো গত সপ্তাহেই মারা গেছো—এখানে এলে কি করে?—ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কবিরাজমশাইয়ের।—তুমি তো মৃত!

উত্তর হলো: আমার দেহটাই আপনারা পুড়িয়েছেন, আত্মাকে নয়। আত্মা অমর। সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছি আমি। আপনারা আমাকে দেখতে পান না, কিন্তু আমি সব-কিছু দেখতে পাই। আপনি দয়া করে আমার বোনকে বাঁচিয়ে দিন।

অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেছেন এর মধ্যে তিনি। বললেন, কিন্তু আমার তো এ-রোগের ওষুধ জানা নেই! কি দিয়ে বাঁচাবো তোমার বোনকে?

আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা জাম গাছ আছে। সেই গাছের গোড়ায় দেখবেন, বড়ো আকারের পাতা-ওয়ালা ছোট্ট একটি গাছ আছে। ঐ গাছের মূল বেটে শৈলকে খাইয়ে দিন, সে সেরে উঠবে।

স্তম্ভিত কবিরাজ। বললেন, তোমার কথামতো এখনই তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। তোমার মা-বাবা তোমার শোকে পাগল হয়েছে। একটিবার তুমি যদি তোমার মাকে দেখা দাও—

কবিরাজের কথা শেষ না হতেই উত্তর পেলেন তিনি—দেবো। আজই সন্ধের পরে বাড়ির ঐ জাম গাছেই আমাকে আপনারা দেখতে পাবেন।

হঠাৎ পাশের গাছগুলো বিরাট একটা ঝড়ের দাপটে যেন দুলে উঠলো। কবিরাজ বুঝলেন বিপিনের প্রেতাত্মা আর এখানে নেই।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত চলে এলেন কবিরাজমশাই শৈলর বাড়িতে। তার মা-বাবাকে সব ঘটনার কথা জানালেন তিনি। বললেন, একটা দা বা কুড়ুল আনুন তো দেখি।—বলে উঠোনের জামগাছটার তলায় গিয়ে দেখেন, হ্যাঁ, ঠিকই আছে গাছটি! বড়ো-বড়ো পাতা তার। গাছটা

কেটে মূল তুলে ফেললেন মাটি খুঁড়ে। ভালো করে বেটে খাইয়ে দেওয়া হলো শৈলকে। তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেলকে ছুঁই-ছুঁই করছে।

কিন্তু এখনই তো তিনি চলে যেতে পারছেন না। মৃত বিপিনের আত্মার কথা সত্যি কিনা, এটা পরীক্ষা করে তবে তো তাঁর ছুটি! মূলের উপকারিতা তাঁকে নিজের চোখেই দেখতে হবে।—ভাবছেন কবিরাজ শ্যামাচরণ, তাছাড়া সন্ধের পর যে সে আসবে এই জাম গাছেই। মরার পর বিপিনের শরীর কি রূপ ধরেছে, সেটাও তো দেখার কৌতূহল!

সন্ধে হবার আগেই সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে জাম গাছটির দিকে চেয়ে। মা মাঝে-মাঝে গিয়ে বসছেন মেয়ের রোগশয্যার পাশে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরেই শৈল ঘুমিয়ে পড়লো।

মা উঠে এলেন বারান্দায়।

সবারই দৃষ্টি আবদ্ধ ঐ জাম গাছটার দিকে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হলো।

কবিরাজ মশাই নিজের নাড়ির স্পন্দন যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছেন—এমন নিস্তব্ধতা।

এমন সময় হঠাৎ জাম গাছটা বিরাট এক ধাক্কায় কেঁপে উঠলো।

প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হলো ডালপালা। রাতের মতো আশ্রয়-নেওয়া দুটো কাক কা-কা রবে ডাল থেকে উড়ে পালালো। যেন তারাও উপলব্ধি করেছে অশরীরী কোনো প্রেতাত্মার।

নিস্তব্ধতায় ভর করে বসে-থাকা তিনটি প্রাণীও যেন কেঁপে উঠলো।

আমি এসেছি মা—ডালপালার মাঝখান থেকে ভেসে এলো অশরীরী বিপিনের কণ্ঠস্বর।

কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোকে—মায়ের কান্নাভরা জিজ্ঞাসা।

মাগো, অনেক চেষ্টা করেও আমি দেহ পেলাম না। তাই তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।

তোর বোন কি সেরে উঠবে?—আবার মায়ের জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ। আমি ওষুধ বলে দিয়েছি। ওতেই সারবে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

আবার বিপিনের কণ্ঠস্বরঃ তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না। আমার কথাও শুনতে পাবে না কোনো দিন। আমি চলে যাচ্ছি।

কেন বাবা ?—হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন মা।

আমার কাজ ফুরিয়েছে। তুমি কেঁদো না মা। শৈলকে সারাবার ওষুধ না-বলা পর্যন্ত আমি এই জাম গাছেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। ও-যে আমার বড় আদরের ছোট বোন—তোমাদের চোখের মণি।

হঠাৎ আবার এক চাঞ্চল্য জেগে উঠলো গাছের ডালপালায়।

অবশ দেহ নিয়ে তিনজন রোগীর ঘরে ফিরে এলেন। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ঘরে কেরোসিনের ল্যাম্পটি জ্বলছে ক্ষীণ শিখায়।

হঠাৎ ওঁরা শুনতে পেলেন, ঘুমের ঘোরে শৈল বলছেঃ দাদা এসেছিল মা, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—আমি যাই—তোর আর কোনো ভয় নেই।

রাতটা জেগে কাটালেন তিনজনেই। দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না কেউই।

সকাল হতেই জেগে উঠলো শৈল। অনেকটা সুস্থ সে।

শ্যামাচরণবাবু লিখেছেনঃ 'এই ঘটনার পর হইতে ঐ গাছের মূল বাটিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অনেক রোগীকে আজ পর্যন্ত নিরাময় করিয়াছি। ইহা আমার প্রেতদত্ত ঔষধ।'

'ভারতী' পত্রিকার অফিসে বসেও প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতেন সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

খুব বেশিদিনের কথা নয়। সবেমাত্র 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার ভার নিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থেকে। সেটা ১২৯১ বঙ্গাব্দ। এর আগে 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা (১২৮৪, শ্রাবণ) থেকে প্রায় সাত বছর (১২৯০) পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার আসতেই কিছু নবীন লেখক ভিড় করলেন ভারতীতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ জামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মাঝে-মধ্যে শান্তিনিকেতন থেকে অজিত চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক 'ভারতী'র অফিসে আসতেন। এ-সম্বন্ধে মণিলাল তাঁর 'আমার কথা'য় জানিয়েছেন, 'বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার (স্বর্ণ-কুমারী) কাছে সবিশেষ ঋণী। নবীন লেখকগণ যাহাতে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। তাঁহার

এই অনুগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। আমিও সেই দলের একজন।'

গড়ে উঠলো এই সব লেখকদের নিয়ে 'ভারতী-গোষ্ঠী'। এর কিছু পরেই মণিলাল 'কান্তিক প্রেস' খুলেছেন ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে। প্রেসের ব্যবসা। এখান থেকেই মণিলালের তত্ত্বাবধানে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হতো। একসময় ভারতীর কার্যালয়ও উঠে এলো কান্তিক প্রেসের তিন তলায়। সবাই বলতো, মণিলালের আসর। এই সাহিত্যিক আড্ডায় তৎকালীন কোন্ সাহিত্যিক যোগ দেননি? এসেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সুকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার। এর পর আড্ডায় সামিল হয়েছেন চারুচন্দ্র রায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক। এঁরাই ছিলেন 'ভারতী-গোষ্ঠী'।

কান্তিক প্রেসের এক তলার এক দিকে প্রেস এবং দোতলার দক্ষিণ দিকের একটা বড়ো ঘরে মণিলালের অফিস। চুটিয়ে সাহিত্যিক আড্ডা চলে এ-ঘরে। কোনো-কোনো দিন অন্যেরা না এলেও প্রতিদিন চারজন অবশ্যই উপস্থিত থাকতেনই এই আড্ডায়। মণিলাল ছাড়াও সত্যেন দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন ও চারুচন্দ্র—এঁরা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।

ছোটবেলা থেকে পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন মণিলাল। মৃতব্যক্তির আত্মা আনিয়ে মিডিয়ম মারফৎ কথাবার্তা বলতেন কিশোর বয়স থেকেই। প্লানচেটের সরঞ্জামও ছিল তাঁর। গভীর অভিজ্ঞতা তাঁর এ-ব্যাপারে। তিনি তাঁর 'ভুতুড়ে কাণ্ড' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় স্পষ্টই জানিয়েছেন, 'আমি প্রেতাত্মার অস্তিত্বে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে বলি নাই এবং যিনি বিশ্বাস করেন তাঁহাকেও সে-বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইতে বলি নাই। ভূত আছে কি না আছে সেই সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশে খুব একটা আলোচনা চলিতেছে, আলোচনার ফল যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় দূর ভবিষ্যতে পরজগতের সহিত ইহজগতের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও হইতে পারে। এ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য জগতের অনেক পণ্ডিত মৃত্যুর পর অবস্থানের সত্যতা স্বীকার করেন।'

এই দৃঢ় বিশ্বাসই মণিলালকে প্রেতচর্চায় অদম্য উৎসাহী করে তুলেছিল।

ভূতকে দেখতে কেমন? তার আকার কেমন হয়?—জানতে ইচ্ছে হয়েছিল একবার মণিলালের। তাই সেবার প্লানচেটের আসরে বসে এক আত্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, ভূত কি সবাইকে দেখা দিতে পারে?

প্রেতাত্মা উত্তর দিয়েছিল ঃ ভূত যে একেবারে দেখা যায় না, তা বলতে পারি না। তারা মধ্যে মধ্যে আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিয়ে থাকে। সেটা কিরকম জানো? আমাদের যখন দেহত্যাগ হয় তখন দেহের যা সম্পর্ক তা ছিন্ন হয়ে যায় বটে, কিন্তু মনের বন্ধনটা আদপেই যায় না—মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসা তেমনিই থাকে; বরঞ্চ দেহ না থাকার দরুন সেগুলো প্রকাশ করতে পারি না বলে, প্রকাশ করার ইচ্ছেটা যে-পরিমাণে প্রকাশ করতে পারি না সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই ইচ্ছে যখন খুব ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন আমাদের একটা আকার তৈরি হয়—সে আকারটা প্রায় আমাদের জীবদ্দশার আকারের মতোই হয়। সে আকারটা কিরকম জানো? মেদ-মজ্জা-অস্থি-সংযুক্ত মানবদেহের মতো নয়, সেটা কতকটা ছায়ার মতো। ছায়ার যেমন হাত-পা-মুখ সব দেখা যায়, কিন্তু তাতে মাংস হাড় থাকে না, সেই রকম।

'ভারতী'র অফিসেও চলে প্রেতচর্চা। প্লানচেট নিয়ে বসেন মণিলাল-সত্যেন-সৌরীন্দ্রমোহন, প্রায় নিয়মিত। এ-যেন নেশায় দাঁড়িয়েছে তাঁদের। চেনা-অচেনা কত আত্মাই না আসে তাঁদের কাছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন প্রেতাত্মাকে। প্রেতাত্মাও কখনও সব কিছুর জবাব দেয়, কখনও বসে বেঁকে। নানান বৈচিত্র্যভরা ঘটনা।

একদিন শান্তিনিকেতন থেকে এলেন অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৮১৮)। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর খুব সুনাম। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি বললেন, থেকে থেকে আমার কেমন যেন মনে হয়, পৃথিবীর রঙ-রূপ সব নিঃশেষ হয়ে আসছে। মানুষের জীবন কখন আছে, কখন নেই। কেন এমন হয় বলতে পারো?—অজিতবাবুর কণ্ঠে বিষাদের সুর।

তামাসা হচ্ছে?—ভারতী-গোষ্ঠীর বন্ধুরা হেসে উড়িয়ে দিতেন অজিতবাবুর কথা।

বিশ্বাস করো তোমরা, মন আমার এমন এক নিস্পৃহ জগতে চলে

যায় যেন কোনো কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। সবকিছুই যেন আমার ফুরিয়ে এসেছে।—অজিতবাবু বলতে থাকেন অবসাদের সুরে, এখন প্রতি সপ্তাহে তোমাদের কাছে ছুটে আসি শান্তিনিকেতন থেকে, আগে কি এত ঘন ঘন আসতাম ?

কবিকে এ-কথা বলেছো কোনো দিন ?

না না, রবীন্দ্রনাথ শুনলে ঠাট্টা করবেন। তাঁর জীবনদর্শন হলো 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

সবাই হাসলেন।

অজিতবাবু অনুরোধ করতে লাগলেন প্লানচেটে বসার জন্য। বললেন, দেখো না কাউকে জিজ্ঞেস করে, আমার এমন মানসিক অবস্থা কেন হলো।

অগত্যা আলমারি থেকে নামালেন মণিলাল প্লানচেটের ছোট্ট টেবিল।

কাকে আনা যায় ?—সবাই ভাবছেন।

হঠাৎ সত্যেন দত্ত বললেন, আমাদের বন্ধু সতীশ রায়ের ধ্যান করো সবাই।

এই সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) ছিলেন সত্যেন দত্ত ও অজিত-কুমারের বিশিষ্ট বন্ধু। আদি নিবাস ছিল বরিশালের উজিরপুরে। বি. এ. পড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন 'ভারতী'তে। এঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি ঃ 'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না তাহা জ্বালিলে নিভিত না' সতীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মাত্র বাইশ-তেইশ বছরের জীবন সতীশচন্দ্রের। এরই মধ্যে তাঁর আন্তরিক সৌহার্দ্যের স্পর্শ লাভ করেছিলেন সত্যেন-অজিত।

ঠিক হলো সতীশ রায়ের আত্মাকে আনিয়ে জিজ্ঞেস করা হোক জগ-তের ওপর অজিতের এই নিস্পৃহতার কারণ কি ?

নিবিষ্ট হয়ে বসলেন এঁরা টেবিলের সামনে। মনে গাঁথা সতীশের মুখ।

টেবিল নড়ে উঠলো।

কে তুমি ?

আমি সতীশচন্দ্র রায়। আমাকে ডাকলে কেন ?

জিজ্ঞেস করা হলো ঃ অজিতের এই নিস্পৃহভাব কেন? এর তো কোনো কারণ আমরা দেখতে পাই না।

জবাব হলো ঃ অজিত স্বল্পায়ু। ওকে আর সাত-আট বছরের মধ্যেই নশ্বর দেহ ছাড়তে হবে। ও মারা যাবে। তোমরা কেউই ওকে ধরে রাখতে পারবে না।

আঁৎকে উঠলেন সকলেই। অজিতকুমারের মুখটা হঠাৎ শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একি শুনলেন তাঁরা?

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাগ করে উঠলেন। বললেন, কেন এ-সব ছেলেখেলা করো বলো তো? এই বয়সে প্রাণবন্ত জীবনে যে উচ্ছলতা তা যে কী ভাবে দমে যাবে, ভেবেছো কি তোমরা?

না, একথা ভাবা হয়নি সত্যি! এমন ভবিষ্যদ্বাণী শুনবেন তাঁরা, একথা কি কল্পনাও করেছিলেন কেউ?

মণিলাল বললেন, ছাড়ো এ-সব। চলো গড়ের মাঠে। বেড়িয়ে আসি।

সবাই বেরিয়ে পড়লেন বেড়াতে। হাসি-গল্পের মাঝখানে সবাই যখন আকণ্ঠ ডুবে আছেন, বিমর্ষ অজিতকুমার তখন মৃত সতীশ রায়ের ভবিষ্যদ্বাণীতে উদ্বেলিত। কারোর প্রবোধেই তাঁর অবোধ মন শান্ত হয় না।

এর পরও বেশ কেটে গেছে কয়েকটা বছর। অজিতকুমার যখনই এসেছেন ভারতীর আড্ডায় তখনই মনে করিয়ে দিয়েছেন বন্ধুদের —আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়। বন্ধুরা 'ধ্যেৎ ধ্যেৎ' করে উড়িয়ে দিতেন তাঁর কথা। কী ছেলেমানুষী চিন্তা করছো?

বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠতো তখন অজিতকুমারের চোখে-মুখে।

সালটা ১৯১৮। ডিসেম্বর মাস। ভারতী-গোষ্ঠীর বন্ধুরা শুনলেন অজিত আক্রান্ত হয়েছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে! এ-সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়—ডাক্তার জানিয়েছে।

সবাই দেখতে যান শয্যাগত বন্ধু অজিতকুমারকে। অভয়বাণী শোনান—তুমি সেরে উঠবে শিগ্‌গীর।

অজিতকুমারের রুগ্‌ণ মুখে সেই অবসাদের পাংশুটে হাসি—আমি আর ভালো হবো না।

দিন এগিয়ে এলো এক দুই তিন গুণতে গুণতে। হঠাৎ ২৯ তারিখে এসে অজিতকুমারের দিন গেল থেমে। মারা গেলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে।

তুমিই না অজিতকুমার, তোমার সতীর্থ কবি-বন্ধু সতীশ রায়ের রচনাবলী সংকলন করেছিলে? সেই বন্ধুই তোমাকে এত বড় রূঢ় আঘাত দিয়ে গেল ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে? জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো বিষাদে ভরিয়ে দিতে পারলো সে? সত্যি হলো তোমার কথা?

বেদনার্ত ভারতী-গোষ্ঠীর হাহাকার ছড়িয়ে পড়লো ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের কান্তিক প্রেসে। গৃহ থেকে গৃহান্তরে। অজিত আর কোনো দিনই এই আড্ডায় আসবে না!

এরও কিছুদিন পরে। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল মারা গেলেন। সেটা ১৯১৩ সাল। স্বর্ণকুমারী স্বামীর মৃত্যুতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রচণ্ডভাবে অবসন্ন। 'ভারতী' আর চলে না। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়ঃ "স্বর্ণকুমারী দেবী শোকে একান্ত কাতর। 'ভারতী' থেকে, সংসারের সবকিছু থেকে তিনি ছুটি নেবার জন্য আকুল। মণিলাল এবং আমি প্রত্যহ তাঁর কাছে যাই, 'ভারতী'র সম্বন্ধে নানা কথা বলে যদি সান্ত্বনা দিয়ে কতকটা সুস্থ করতে পারি; এবং আমরা দুজনে 'ভারতী'র সম্পাদনার কাজে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেও প্রত্যেক বিষয়ে 'ভারতী'র কাজে যতখানি পারি তাঁর মনকে নিমগ্ন রাখবার প্রয়াস পাই—তবু বুঝেছিলুম, 'ভারতী'কে বুঝি রাখা যাবে না।"

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এমন একটি পত্রিকার যে খুব প্রয়োজন! এভাবে 'ভারতী'কে মরতে দেওয়া যায় না।

একদিন মণিলাল বললেন, দেখি প্লানচেট ক'রে, জানকীনাথের আত্মাকে আনানো যায় কিনা।

শ্বশুর অবনীন্দ্রনাথের ঘরেই প্লানচেট পাতলেন তিনি। মূর্ত হলেন অশরীরী জানকীনাথ।

'ভারতী'র ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করলেন মণিলাল, 'ভারতী' কি এই বছরেই বন্ধ হবে?

জবাব হলোঃ না।

কিন্তু উনি (স্বর্ণকুমারী) যে কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না সম্পাদনার ভার নিতে।

উনি না নিলেও চলবে।

কি করে ?

তুমি আর সৌরীন দুজনে 'ভারতী' চালাবে—ওর সম্পাদক হয়ে।

প্লানচেটে আসা জানকীনাথের আত্মার কথাও সত্যি হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী সম্পাদনার ভার দিয়ে দিলেন মণিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহনেব হাতে।

১৩২২ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পারে গিয়েও স্বামীকে ভুলতে পারেননি

গিরিজাশঙ্করের স্ত্রী—এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন

প্রখ্যাত সাংবাদিক মতিলাল ঘোষ

ঢাকার রামশঙ্কর সেনকে সে-কালে কে না চিনতো? কেবলমাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেই নয়, নানান জনহিতকর কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়! তাছাড়া যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষের পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মতিলাল ঘোষের (১৮৪৭-১৯২২) অগ্রজ ছিলেন শিশিরকুমার। ১৮৬৮-তে অগ্রজ শিশিরকুমারের সহযোগী হয়ে মতিলাল যশোহরে নিজের গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। এটিই পরে ইংরেজি দৈনিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯১-এর ১৯ ফেব্রুআরি। সাংবাদিক হিসেবে তিনি ছিলেন নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য মতিলাল প্রথমে ছিলেন মডারেটপন্থী। পরে চরমপন্থী মতাবলম্বী হন। শিশির-কুমারের মৃত্যুর পর তিনি সম্পাদক হন অমৃতবাজার পত্রিকার।

এঁরই আত্মীয় রামশঙ্কর সেন। রামশঙ্করের বড় ছেলে গিরিজাশঙ্করও ছিলেন নামকরা ব্যারিস্টার। বিয়ে করেছেন। বিদুষী ও সুশ্রী স্ত্রী।

বিবাহিত জীবন খুব সুখেই কাটছিলো গিরিজাশঙ্করের। পৈতৃক বাড়িতে না থেকে তিনি পৃথক্ ভাড়াবাড়িতে তখন বাস করতেন।

কিন্তু এ-সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন স্থায়ী হলো না। মাস ছয়েক যেতে-না-যেতে গিরিজার স্ত্রী মারা গেলেন। কয়েকটা বছর কেটে গেল। হঠাৎ গিরিজা ভালোবেসে ফেললেন এক খ্রীস্টান তরুণীকে। স্থিরও করে ফেললেন তাকেই তিনি বিয়ে করবেন।

বাবা রামশঙ্কর অনেক বোঝালেন ছেলেকে। তিনিই তাঁর বিয়ে দেবেন তাঁদের স্বজাতীয়া বিদুষী ও সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। খ্রীস্টান মেয়েকে গিরিজা যেন বিয়ে না করেন।

বাপ-মায়ের প্রস্তাবে রাজি নন গিরিজা। তিনি ঐ খ্রীস্টান মেয়েটিকেই বিয়ে করবেন। প্রয়োজন হলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান হতেও রাজি তিনি। ক্ষোভে-দুঃখে দিন কাটান গিরিজার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন। গিরিজা বাবার মুখের ওপর বলেই দিলেন একদিন, আমি কথা দিয়েছি মেয়েটিকে। আমি একেই বিয়ে করবো।

অগত্যা আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন বাবা—ছেলেকে মানুষ করেছেন, নামকরা ব্যারিস্টার এখন সে, ভালো-মন্দও বুঝতে শিখেছে। সে যা ভালো বোঝে, করবে।

এদিকে গিরিজাশঙ্কর ভাবী পত্নীর প্রেমে ডুবে আছেন। রোজই বিকেলবেলা নিজের ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে যান এখানে-ওখানে। ফেরেন রাত করে।

সেদিনও তাঁরা বেরিয়েছেন এক বাগানবাড়িতে যাবার জন্যে। সঙ্গে আছেন ভাবী পত্নীর দুই বোন। গিরিজাশঙ্করের ভাবী শ্যালিকা। বাগানে বসে গল্পগুজব সেরে সন্ধের পর ঘোড়ার গাড়িতে চাপলেন তাঁরা। সহিস ঘোড়ার লাগামে হাত দিতেই ঘোড়াটি যেন হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সামনের পা দুটি ওপরে তুলে চিঁহিঁ স্বরে চিৎকার করে উঠলো।

একি ব্যাপার ঘোড়াটির। এতদিন গাড়ি চালাচ্ছে সহিস, ঘোড়ার এমন কাণ্ড তো তার চোখে পড়েনি! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সহিস আবার লাগাম ধরে টান দিতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়াটি দৌড়লো। মনে হচ্ছে, কে যেন তার পিঠে ক্রমাগত চাবুক মেরে ঘোড়াটিকে ছুটিয়ে

নিয়ে যাচ্ছে। সহিস কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারছে না। গাড়ির মধ্যে ভাবী পত্নী ও শ্যালিকাদ্বয়কে নিয়ে বসে গিরিজাশঙ্কর আতঙ্কে হৈ-চৈ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি সামনের একটি বড় গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড বেগে ছিটকে গিয়ে পড়লো দূরের এক শুকনো ডোবার মধ্যে। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন গিরিজাশঙ্কর ও তাঁর ভাবী পত্নী। মাথায় ভারী চোট লেগেছে। কিন্তু আশ্চর্য! দুই বোন ও সহিস সম্পূর্ণরূপে আঘাতের হাত থেকে বেঁচে গেছে। তারা সুস্থ।

পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে অজ্ঞান দু'জনকে ধরাধরি করে যার-যার বাড়ি পেঁছে দিল। রামশঙ্কর খবর শুনে ছুটে এলেন ছেলের বাসায়। বড়ো ডাক্তার এলো। অনেক চেষ্টা করেও গিরিজার জ্ঞান ফিরলো না। ঘোষেদের বাড়ি থেকে অনেকেই এলেন খবর পেয়ে। মতিলালও এলেন। শুনলেন সব। আশ্চর্য ব্যাপার! গিরিজার জ্ঞান ফিরছে না কেন?

চার-পাঁচ দিন কেটে গেল গিরিজার অজ্ঞান অবস্থায়। ডাক্তার হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। বাড়ির প্রায় সকলেই নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে অজ্ঞান গিরিজার শয্যাপার্শ্বে বসে। মুখে তাদের অজানা ভয়ের ছাপ। মা মাথা কুটছেন ঠাকুরের পায়ে। বাবা মানত করেছেন ঈশ্বরের কাছে যাতে ছেলে জ্ঞান ফিরে পায়।

ঠিক ছ'দিনের মাথায় জ্ঞান হলো গিরিজাশঙ্করের। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে আনা হলো। তিনি সব দেখে বললেন, যখন জ্ঞান ফিরে এসেছে, তখন আর ভয়ের কিছু নেই। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু একি হলো? সেই রাত্রেই গিরিজাশঙ্কর মারা গেলেন। মৃত্যুর শোক ছড়িয়ে পড়লো সেন-পরিবারের ঘর থেকে ঘরে। হাহাকারে ভরিয়ে দিল প্রতিটি মানুষের বুক। মা শয্যা নিলেন। বাবা পড়লেন অসুস্থ হয়ে।

একদিন মতিলাল দেখতে এলেন রামশঙ্করকে। আগের থেকে সুস্থ হলেও, দারুণ দুর্বল তিনি। মতিলালের আশংকা ছিল, হয়তো রামশঙ্কর

পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু না, রামশঙ্কর মতিলালের সঙ্গে কথা কইলেন সম্পূর্ণ প্রশান্ত ও উদ্বেগশূন্য ভাবে।

মতিলালের কেমন যেন খট্‌কা লাগলো! অথচ পরিষ্কার করে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না তাঁর পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে। রামশঙ্করের এই ভাব দেখে তিনিও বিস্মিত। তবুও সান্ত্বনা দিতে হবে। তাই বললেন, যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না—এখন একটু সুস্থ হতেই হবে।

রামশঙ্কর বললেন, দেখ মতি, এখন বেশ বুঝতে পারছি, সারাটা জীবন বৃথায় কাটালাম। তুমি তো জানো, আমি গিরিজাকে কতটা ভালোবাসতাম, আর সেজন্যই তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে কত বড়ো আঘাত পেয়েছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, গিরিজার ওপর আমার কোনোও অভিযোগ নেই। তার মৃত্যুই বোধহয় আমার মনে এক প্রশান্তি এনে দিয়েছে!

অবাক্‌-বিস্ময়ে রামশঙ্করের কথাগুলো শুনছেন মতিলাল আর ভাবছেন, এ কি করে সম্ভব? পুত্রের মৃত্যুতে পিতার হৃদয়ে প্রশান্তি! তাও আবার রামশঙ্করের মতো স্নেহপ্রবণ পিতার পক্ষে! এর অন্তর্নিহিত ভাব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না মতিলাল।

মতিলালের মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে রামশঙ্কর আবার বলতে শুরু করলেন, তুমি ভাবছো মতি, আমি এ কেমনতর বাবা! কিন্তু তুমি তো জানো, আমি এক ঘোরতর নাস্তিক। আগে বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু এখন আমার সে-ভুল ভেঙে গেছে। এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার গিরিজা আছে, সে তার পতিপ্রাণা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।—কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে যেন শোকের উচ্ছ্বাসটা চেপে ধরে বুকের মধ্যে টেনে রাখলেন রামশঙ্কর। দু'ফোঁটা চোখের জল দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো তাঁর গণ্ডস্থলে। চোখ দুটো ডানহাতের তালু দিয়ে মুছে নিয়ে আবার বললেন রামশঙ্কর—দেখ মতি, মৃত্যুর পর যদি আমাদের অস্তিত্ব থাকে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে যদি আবার মিলন হয়, তাহলে শোক করবো কেন?

কিন্তু কি দেখে আপনার একথা মনে হলো?—প্রশ্ন করলেন পরলোকে-বিশ্বাসী উচ্চশ্রেণীর মিডিয়ম মতিলাল ঘোষ। তাঁর কাছে

এবার যেন সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রামশঙ্কর।

বললেন রামশঙ্কর, সেই কথাটিই তোমাকে বলি। গিরিজা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে যেদিন গুরুতর আঘাত পেলো, তার দুর্ঘটনার কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরতে থাকে। শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। চারিদিকে আঁধার দেখতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি বিছানা নিলাম। ক্রমে অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় হঠাৎ দেখি, এক জ্যোতির্ময় মূর্তি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, 'ভগবান দয়াময়। তুমি ছেলের জন্যে কাঁদছো কেন? সে তো ভালো জায়গায়ই যাচ্ছে।' এই কথা কটি বলেই সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি অন্তর্হিত হলেন ভাবলাম বোধহয় অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি ধীরে-ধীরে সুস্থ হলাম। এদিকে গিরিজার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। জ্ঞান তো ফিরছেই না। রাত্রে গিরিজার সেবাশুশ্রূষা করার জন্যে আমার এক পুরনো চাকর তার কাছে থাকতো। আমার স্ত্রী প্রায় দিনই রাতের দিকে বাড়িতে ফিরে আসতেন চাকরটিকে বসিয়ে রেখে। সেই চাকরটি হঠাৎ একদিন এসে বললো, হুজুর, আমার ভয় হচ্ছে, দাদাবাবু বোধহয় ভালো হবেন না। জিজ্ঞেস করলাম, এই অলক্ষুণে কথা বলছিস কেন? তার উত্তরে সে বললো, হুজুর! বৌঠাকরুণ তো বহুকাল মারা গেছেন, কিন্তু প্রায় রাতেই তাঁকে দাদাবাবুর বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখি। সেদিন আমার খুব ভয় করছিল হুজুর! আমি আর ওঘরে থাকতে পারবো না।

স্থিতপ্রজ্ঞ মতিলাল। প্রতিটি দৃশ্য যেন তাঁর কাছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। তিনি জানেন, এমন ব্যাপার ঘটে। ঘটতে পারে।

রামশঙ্কর আবার বলতে শুরু করলেন, সেইদিন রাত্রেই গিরিজা মারা গেল। —একটু স্থির হয়ে কি যেন ভাবলেন রামশঙ্কর। তারপর বললেন, শুধু এটাই নয়, আমার ছোট ছেলে সরকারী চাকরি নিয়ে দূরে এক মফঃস্বল শহরে থাকে, তুমি জানো! তাকে তার দাদার অ্যাক্সিডেন্টের কথা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম। সে-চিঠি পাওয়ার আগেই সে ছুটি নিয়ে বাড়ি এলো। এসে যা বললো, তাতে আমার আর প্রেতাত্মায় অবিশ্বাস ব'লে কিছু রইলো না।

মতিলালের সপ্রশ্ন দৃষ্টি।—কি বলেছিল সে?

বললো, যেদিন অ্যাক্‌সিডেন্ট হয় সেদিন রাত্রে সে এক স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যে তার বৌদি তাকে এসে বলছে, ঠাকুরপো, তোমার দাদাকে ছেড়ে এসে এখানে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা নিয়ে বাস করছি, তা তোমাকে আমি কখনোই বোঝাতে পারবো না। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারি, তোমার দাদা আমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে অন্য মেয়ের প্রেমে ডুবে আছে। এ-আমি সহ্য করতে পারছি না। তাই তাকে এবার আমার কাছে একেবারেই নিয়ে এলাম। আমাদের আবার নতুন করে বিয়ে হলো।

ছোট্ট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন রামশঙ্কর। কোনো যুক্তি, কোনো আশ্বাস, কোনো বিশ্বাসই তো তাঁর শোককে বেঁধে রাখতে পারছে না! পিতার অপত্য স্নেহের ঢেউ যে সব যুক্তি-বিশ্বাসকে প্রচণ্ড বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মতিলাল স্থির হয়ে বসে সব শুনছেন। তাঁর হৃদয়ে নেই কোনো চঞ্চলতা, নেই উদ্বেগ। জিজ্ঞেস করলেন, খ্রীস্টান মেয়েটির কি খবর? সেও তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল!

হ্যাঁ। —রামশঙ্কর বললেন, সেও পাঁচ-ছ' দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। এখন সে সুস্থ। অজ্ঞান অবস্থায় সে একদিন বলেছিল, সে যেন অন্য এক জগতে গেছে। সেখানকার একটি জ্যোতির্ময়ী স্ত্রী বৈধব্য বেশে সরাসরি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, তোমাদের বিয়ে আমি কখনোই হতে দেব না। আমার স্বামীকে আমি আমার কাছেই নিয়ে আসবো! —তার চোখে-মুখে তখন প্রতিহিংসা গ্রহণের ক্রূর ছাপ। বাগান থেকে ফেরার পথে মৃত বৌমার প্রেতাত্মাই ঐ ঘোড়াটিকে নির্দয় ভাবে অদৃশ্য হাতে চাবুক মেরে ছুটিয়েছে। সে কথাও প্রকাশ করেছে সে। —একটু চুপ করে থেকে বললেন রামশঙ্কর, আমি সেদিন থেকে একটা কথা প্রতিনিয়ত ভাবছি মতি, পরলোকে গিয়েও মৃত আত্মা তার প্রতিশোধ-স্পৃহা ভুলতে পারে না!

Love is the ordeal of true love.

মাথা নাড়লেন মতিলাল। দু'চোখে তাঁর জলের ধারা। এ বিরাট বিশ্ব নিয়ে মহাপ্রভুর কী অসামান্য অন্তহীন লীলা। এর আদি নেই, অন্ত নেই, অজ্ঞেয় এই আদি-অন্তের বিচিত্র জীবন-খেলা মানুষের চোখে আজও কুয়াশায় ঘেরা।

প্রখ্যাত প্রিয়নাথ বোসের সার্কাসের দলও ভূতের কবল থেকে রক্ষা পায়নি

কবি-নাট্যকার মনোমোহন বসুর দুই ছেলে, প্রিয়নাথ বসু ও মতিলাল বসু 'বোসের সার্কাস' খুলেছিলেন। সেকালে এই সার্কাস-দলের সুনাম খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম—এমন জয়গা ছিল না যেখানে সার্কাসের খেলা দেখিয়ে এঁরা মানুষকে বিস্ময়-মুগ্ধ করেননি। শতাধিক ব্যক্তির দল। সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, জীবজন্তু, পশুপক্ষী। আর কৌশলী সুনিপুণ খেলুড়ে। প্রিয়নাথ তাঁর সার্কাসের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ পালের 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস' কিনে নিয়ে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনি বেড়ে গেল মানুষজনও। শ্যামবাজারের হরিদাস মতিলাল (ছদ্মনাম 'মধুসূদন') আর শিমলে-কাঁশারিপাড়ার মতিলাল (ছদ্মনাম 'বেদব্যাস') ছিলেন উচ্চাঙ্গের দুজন 'রিং মাস্টার'। মেয়েদের মধ্যে সুচিন্তা, সুকুমারী, সুশীলাসুন্দরী, হিরণ্ময়ী ও মৃন্ময়ী প্রমুখ ছিলেন বারের খেলা, রিংয়ের খেলা, হাতির পিঠে নানান কসরত, ঘোড়ার খেলা, সাইকেলের খেলা প্রভৃতিতে খুব নামকরা। প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রক্রীড়ক মহাবীর

বাদলচাঁদ এবং তাঁর স্ত্রী নূরজাহান বাঘ-সিংহের নানারকম খেলা দেখিয়ে বহু সোনা-রুপোর মেডেল পেয়েছেন। হরাইজান্টাল বারের নিপুণ খেলোয়াড় জোড়াসাঁকো মাথাঘষা গলির ভূতনাথ দাস যখন বারের ওপর চড়ে কঠিন কঠিন খেলাগুলো দেখাতেন তখন দর্শক দমবন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো ভূতনাথের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে।

'বোসের সার্কাস' সেবার ভাইজাগ শহরে খেলা দেখিয়ে চলে এসো কোকনডা শহরে। কথা হলো, পিথাপুর রাজ-কলেজের গায়ে একটা বিরাট মাঠে এঁরা তাঁবু ফেলবেন। কিন্তু এতগুলো লোক জন্তু-জানোয়ার নিয়ে রাতের জন্যে থাকবে কোথায়? পিথাপুর-রাজার একটা পোড়ো বাড়ি ছিল মাঠটার প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে। রাজবাড়ির অনুমতি নিয়ে সার্কাসের ম্যানেজার বিহারীলাল মিত্র এই বাড়িতেই একটি রাতের জন্য থাকার ব্যবস্থা করলেন।

যখন এই পোড়ো বাড়িতে যাবার উদ্যোগ করেছেন সবাই, তখন গ্রামের অনেক বয়স্ক লোক এঁদের বাধা দিতে এলেন। সবাই একবাক্যে বললেন, ও-বাড়িতে যাবেন না! ওখানে ভূত থাকে।

ভূত! —হেসে উড়িয়ে দিলেন সার্কাস-দলের সবাই। ভাবখানা তাঁদের, এতগুলো মল্লবীর যেখানে থাকে, সেখানে ভূত এসে কি করবে? যে-ভদ্রলোক বুকে হাতি তোলেন, তিনি বললেন, আমার চেহারাটা দেখেছেন? ভূতও আমাকে ভয় করে।

অগত্যা সবাই চুপ করে গেলেন। সকলে সেই পোড়ো বাড়িতেই রওনা হলেন। বাড়িটির বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নাথ বসু এইভাবে: 'আমাদিগকে প্রথমে বৃহৎ বাংলার প্রকাণ্ড ফটক পার হইতে হইল। ভিতরে ঘোর অন্ধকার—আমাদের হাতে কতিপয় হাত-লণ্ঠন আছে মাত্র। দেখা গেল, প্রায় একতলা-সমান প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ একটি ভূখণ্ডের মধ্যে ৪।৫ খানি ইংরাজি ধরনের বাংলা এবং ৫।৬টি আঙিনা আছে। প্রতি আঙিনায় ২।৩টি করিয়া বলবান আম্রবৃক্ষ; গাছগুলি আম্রে ভরিয়া আছে, কিন্তু সমস্তই কাঁচা। বাড়িখানির অনেকগুলি প্রাঙ্গণ; কোনও প্রাঙ্গণ সান-বাঁধানো, কোনও প্রাঙ্গণ বা সুন্দর টাইল-মণ্ডিত।

এত রাত্রে এই অজ্ঞাতপূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে না থাকিয়া যাহাতে সকলে একত্রে থাকা যায় তাহার ব্যবস্থা করিলাম। সেইজন্য একখানি

বাংলায় যত খেলোয়াড় বাবুদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সেই বাংলার মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ হলঘর এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ গৃহ ; সেই দুইটি গৃহের মধ্যে বাবুদের বিছানা পড়িল। হলঘরের সম্মুখের বারান্দায় ৩।৪টি উনান প্রস্তুত করিয়া রসুই চড়িল ; ইহারই সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড সান-বাঁধানো চত্বর বা প্রাঙ্গণ। গ্রীষ্মাধিক্যবশত আমি, বিহারীবাবু ও রাখালবাবু সেই চত্বরের উপরেই বিছানা করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কাজকর্মের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম।'

মধ্যরাত। হঠাৎ এঁরা তিনজনেই দেখতে পেলেন, রান্নার জায়গার পেছনদিককার হলের মধ্যে একটা মানুষের মতো কি যেন শূন্যে উড়ে গেল এবং পরক্ষণেই একটা কিছু পড়ে যাবার ভয়ানক শব্দ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনজনেই। ব্যাপার কি ! হঠাৎ তাঁদের কানে এলো একটা গোঁ-গোঁ শব্দ। পালোয়ান সতীশ চাটুজ্জে ও বনমালী দাসকে ডেকে বললেন প্রিয়নাথ—দেখ তো, বাইরে কিসের শব্দ !

ওঁরা বাইরে গিয়ে দেখলেন, ভূতনাথ দাস একটা ছোট্ট চৌবাচ্চার মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে সেই চৌবাচ্চার সানের ওপর মুখ ঘষছে আর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

সবাই ছুটে এলেন। এলেন বীর-পালোয়ানরা। কিন্তু সবাই যেন ভয়ে কাঠ। যে-লোক সাত মণ পাথর বুকের ওপর ভাঙেন তাঁর পা দুটো ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে, যিনি জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়েন তাঁর গায়ের লোমগুলো খাঁড়া হয়ে উঠেছে, আর যিনি অবলীলাক্রমে কাঁধে দশ-বারো জন মানুষ নিয়ে সাইকেলের খেলায় হাজার-হাজার দর্শকের হাততালি পান, তাঁর কাঁধের পেশীগুলোও অসাড়।

চৌবাচ্চা থেকে ধরাধরি করে ভূতনাথকে তোলা হলো। শুইয়ে দেওয়া হলো একটা বিছানায়। অনেকক্ষণ ধরে শুশ্রূষার পর সম্বিৎ ফিরে পেল ভূতনাথ। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে যেন ছাদের দিকে কাকে খুঁজছে।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল ভূতনাথ ?

ভয়ার্ত কণ্ঠে ভূতনাথ বললো, ওরা আবার আসবে।

কারা ?

চারটি যম ! কী বীভৎস দেখতে সবাই !—আবার কাঁপুনি শুরু হয়েছে ভূতনাথের।

তুমি চৌবাচ্চার মধ্যে গিয়ে পড়লে কি করে ?—সতীশবাবুর প্রশ্ন।

তখনও ভূতনাথের আতঙ্কিত চোখ দুটি অবিরাম ঘুরছে ছাদের দিকে। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলতে শুরু করলো ঃ হলের উত্তর দিকের ঘরে আমি, হরিমতিবাবু, বুদ্ধু মিয়ার ছেলে বেটা—এমনি পাঁচ-ছ'জন বিছানা করেছি। আমাদের পেছন দিকের দরজার বাইরে একটা ছোট বারান্দায় বাদলচাঁদ আর নুরজাহান শুয়ে। হলটার পশ্চিম দিক্‌কার ঘরটায় বিছানা পড়েছে বেণীবাবু, সতীশবাবু, তিনকড়িবাবুদের। আমি দেখলাম, রান্না হতে দেরি আছে এখনও। একটু গড়িয়ে নি বিছানায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিলেই একটু তন্দ্রা এসেছে আমার। মনে হলো যেন, কে আমার পা ধরে টানছে। ভাবলাম বনমালীবাবু আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন। কিন্তু না, পরক্ষণেই মনে হলো আমার হাত ধরেও কে-যেন টানছে। তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি, ঘরে যে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছিল, সেটা নেই। ঘর অন্ধকার।

অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছে ভূতনাথ। সার্কাসের প্রায় সব লোকই জড়ো হয়েছে ভূতনাথের বিছানার পাশে! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই ভূতনাথের দিকে চেয়ে আছে।

তারপর ?—প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন।

কয়েকবার ঢোক গিললো ভূতনাথ। পরে আবার বলতে শুরু করলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে রে ? ব্যস, যেই না বিছানায় উঠে বসেছি সঙ্গে সঙ্গে তিন-চার জন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভীষণ আকৃতির মূর্তি এসে আমাকে বিছানা থেকে ওপরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কিছু বোঝবার আগেই তারা ঐ চৌবাচ্চাটার মধ্যে ধপ্‌ করে আমাকে ফেলে দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এই দেখুন আমার হাঁটু আর কনুইয়ের অবস্থা।

ইস্! বলে সবাই চমকে উঠলো। হেরিকেনের আলো ভূতনাথের সামনে এনে দেখলেন প্রিয়নাথ, ওর কনুই ও হাঁটুদুটো গভীর হয়ে ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি। বিহারীবাবু আর রাখালবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন প্রিয়নাথ, তাহলে শূন্যে উড়ে যেতে তাঁরা যাকে দেখেছিলেন সে এই ভূতনাথই। ওঁরা দু'জনেই গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন।

ভূতনাথ বললো, বাবু, বিশ্বাস করুন, ওরা মানুষ নয়। বেশ মনে

আছে, ওদের মাথার চুলগুলো ঠিক যেন খেজুর গাছের পাতার মতো বড়ো বড়ো।

'ভূতনাথের কথা শেষ হইতে না হইতে সকলে শুনিলাম—আমাদিগের পশ্চাৎভাগ হইতে কে একজন ভয়ংকর চিৎকার করিয়া ভয়চকিত স্বরে বলিল – ওগো, তারা ঐ আবার আসছে।

কি ভয়ংকর ব্যাপার! কি মহামারী কাণ্ড! রণস্থলে সেনানায়কের কোনোরূপ রকেট বা হাউই ছোড়ার ইঙ্গিত অথবা তূর্যধ্বনি শুনিবামাত্র সৈনিকগণ যেমন উন্মত্ত হইয়া মুহূর্তমধ্যে আপনাপন বন্দুকাদি চালনা-দ্বারা গুড়ুম শব্দে মেদিনী কম্পান্বিত করিয়া বিপক্ষ সৈন্যবিনাশে ধাবিত হয়—'ওগো তারা ঐ আবার আসছে'—এই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে ভয়ংকর ভয়াবহ ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিবেন না।

পুরুষ ও রমণীগণ এককালে কে কোথায় পলাইবে স্থির করিতে পারিল না। সুচিন্তা, সুকুমারী, সুশীলা, হিরণ্ময়ী, মৃন্ময়ী প্রভৃতি বীরাঙ্গনাগণ 'বাবা গো মা গো' রবে চিৎকার করিতে করিতে বেহারীবাবু ও বেদব্যাসের (হরিমতিবাবুর ছদ্মনাম) ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। বেহারীবাবুর হস্ত হইতে তাওয়া দেওয়া তামাকু লইয়া বেদব্যাস সবেমাত্র পান করিতে শুরু করিয়াছেন—স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ অজ্ঞানবৎ উহাদের উপর আসিয়া পড়িল। বেদব্যাসের হস্ত হইতে চতুর্দিকে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমাদিগের তিনজনের বিছানা একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মাটি হইয়া গেল। ভূতনাথ পুনরায় জ্ঞান হারাইল, পুনরায় যেন ঘন-ঘন ফিটের ন্যায় হইতে লাগিল। সতীশ চাটুজ্জের ঘোর কম্পন উপস্থিত। বেণীবাবুর হস্তের যষ্টি থর-থর কাঁপিতেছে। রন্ধনশালা হইতে দীননাথ লম্ফ দিয়া আমাদিগের দিকে আসিবার কালীন মস্তকে চালের বাতায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হইলেন। রমণী-গণের ভীতিজনক চিৎকার ও পুরুষগণের হৈ-চৈ শব্দে সেই ঘোরা দ্বিপ্রহর রজনীযোগে পিথাপুরের রাজবাড়ি যথার্থই কম্পান্বিত হইতে লাগিল। আবার বুঝি কি এক অভিনব ভৌতিক কাণ্ড হইল ভাবিয়া প্রাণভয়ে গোপাল ডুরিয়া ও সহিসগণ বহির্ভাগের আস্তাবল বাটী হইতে দৌড়িয়া আসিল। ('নাট্যমন্দির', ফাল্গুন, ১৩১৭)

এত বড়ো-বড়ো ষণ্ডামার্ক চেহারার সাহসী বীর এই সার্কাসের দলে, অথচ তাদের এই অবস্থা হবে ভূতের নামে, এ-কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না প্রিয়নাথ! কিন্তু পাশের ঘর থেকে এই 'ওগো, তারা আবার আসছে' কথা কটি বললো কে? প্রিয়নাথ উঠলেন বিছানা থেকে। এসে ঢুকলেন পাশের ঘরে। দেখেন তাঁরই ভাই মতিলাল বোস হেরিকেনের ক্ষীণ আলোয় একখানি সংবাদপত্র পাঠ করছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। কৌতুক ও রঙ্গপ্রিয় মতিলালের স্বভাব সকলেই জানে।

কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার হয়ে গেল প্রিয়নাথের কাছে যে, যত বড়ো বীরই হোক না কেন, প্রেতাত্মার নামে সবাই ভয়ে কেঁচো হয়ে যায়।

ভূতনাথের এই অবস্থা দেখে কেউই আর আলাদা হয়ে থাকতে চাইল না। দরকার হলে পুরো রাতটাই জেগে কাটাবে কিন্তু আলাদা হয়ে নয়, একত্রে একঘরে বসে। কিন্তু ঘুমুবে না বললেই তো হয় না! সারা-দিনের পরিশ্রমে অনেকে ক্লান্ত! তাই কেউ-কেউ ঘুমিয়ে পড়লো। পৃথক্ ঘরে কেবল মহাবীর বাদলচাঁদ ও তার স্ত্রী নুরজাহান। কথা হলো, ওদের ঘরের সামনে পাহারায় থাকবে বেহারী চাকর আমিরুদ্দিন।

রাত্রি প্রায় দেড়টা! স্তব্ধ হয়ে এলো পিথাপুরের রাজার বাংলো।

হঠাৎ আমিরুদ্দিনের 'ধর্ ধর্' চিৎকার শুনেই এ-ঘর থেকে সকলে লাঠি আর হেরিকেন নিয়ে ছুটে গেল পাশের ঘরের সামনে পাহারারত আমিরুদ্দিনের কাছে। আমিরুদ্দিনকে দেখে সবাই বিস্মিত। বারান্দা ও দেওয়ালের এক কোণে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে সে। হাতে লাঠিটা ধরা। চোখ দুটো দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে! মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে গ্যাঁজলা।

চারিদিকে অন্ধকার। কোনো রকমে আমিরুদ্দিনকে সুস্থ করে তোলা হলো।

কী ব্যাপার আমিরুদ্দিন? তুমি এমন অবস্থায় পড়ে ছিলে কেন? —রাখালবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বাবু, কি বলবো, আমার মাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে। এমন সময় সামনে শুকনো পাতার খসখস শব্দ শুনে 'কোন্ হ্যায়' বলে হাঁক দিলাম। অমনি আমার সামনে-রাখা কেরোসিনের ডিবেটা গেল নিবে। তারপরেই

বিরাট লম্বা দুটো হাত দিয়ে আমার গলাটা এমনভাবে টিপে ধরলো যে আমি 'ধর্ ধর্' দু'বারের বেশি বলতেই পারলাম না —ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো আমিরুদ্দিন. বাবু, বিশ্বাস করুন, এরা মানুষ নয়! আমার গলায় যে আঙুলগুলো দিয়ে টিপে ধরেছে সেগুলো শুধুই হাড়। তারপর ঐ রোয়াকের ধার থেকে টেনে এনে আমাকে এই কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর কিছু মনে নেই আমাব।

সবাই ভালোভাবে আমিরুদ্দিনের গলার দাগ পরীক্ষা করতে লাগলো। সত্যিই, কঠিন কোনো পদার্থের চাপে গলার জায়গায়-জায়গায় বসে গেছে. এবং লাল হয়ে উঠেছে।

এবার সত্যিই ভয় পেলেন প্রিয়নাথ স্বয়ং। ভয়ের কথাই তো! দু' দুটো ভৌতিক ঘটনা যে-ভাবে খনই পর-পর ঘটে গেল, তার তো কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পান না প্রিয়নাথ। বললেন, রাতটা কোনো রকমে কাটাও। সকাল হতেও অন্য বাড়ির খোঁজ করতে হবে।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এলো! চার-পাঁচজন বেরুলেন বাড়ি খুঁজতে। কিন্তু কোথাও খালি বাড়ি পাওয়া গেল না। পুরো বাড়ি না পেলে শতাধিক লোক থাকবে কোথায়? বাধ্য হয়ে এ-রাত্রিটাও এই বাড়িতে থাকতে হলো। আজকেও সার্কাস-খেলা দেখানো গেল না। কিন্তু আজকে থাকার ব্যবস্থাটা একটু অন্যরকম করা হলো। পাশের ঘরটায় অনেকে একসঙ্গে থাকবেন এবং দ্বিতীয় ঘরে থাকবেন প্রিয়নাথকে নিয়ে অন্যরা একসঙ্গে। প্রিয়নাথ বোসের কথায়ঃ 'গৃহের মধ্যস্থলে একটি মশারি খাটানো হইল—তন্মধ্যে বাগবাজারের বেণীমাধব ঘোষ ও সতীশ চট্টোপাধ্যায় ভূতনাথকে মধ্যস্থলে লইয়া শয়ন করিলেন। মশারির বাহিরে উভয় পার্শ্বে মধুসূদন, বেটা, আঁজুবাবু ও কাঁশারিপাড়ার বার-প্লেয়ার মহেন্দ্র (হুলোবাবু) রহিলেন। আশে পাশে আরো ৭।৮ জন লোক শুইলেন। অতবড় বৃহৎ গৃহের মাত্র একটি দ্বার ছিল—ইহার বহির্ভাগের বারাণ্ডায় ৪।৫ জন সহিস ও বাজে লোক এবং হ্যাকটর ও জ্যাক নামক শিক্ষিত কুকুরদ্বয়কে রাখিয়া দিলাম। সার্কাসের ক্রীড়া হউক বা না হউক, রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার পূর্বে শ্রীমান দীননাথ মোহান্ত কিছুতেই তাঁহার রন্ধনকার্য শেষ করিতে পারিলেন না, গত কল্যকার

দিবা-রাত্রির নিদারুণ পরিশ্রম ও জাগরণে সকলেই ক্লান্ত ছিলেন। রাত্রি ৮টা বাজিতে না বাজিতে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। প্রাঙ্গণে বসিয়া আমি বাজারের হিসাবপত্র চেক করিতেছি '

এমন সময় আচম্‌কা কুকুর দুটো তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের কাচের জানালা ভাঙার শব্দ।

চমকে উঠেই প্রিয়নাথ সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিয়ে বাইরে এলেন। বহুলোকের চিৎকার ও আর্তনাদ শুনে সকলেই পাশের ঘরের দরজার সামনে আসতেই লক্ষ্য পড়লো কাচের জানালার কাচগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড আর্তনাদ। হঠাৎ হেরিকেনের আলোয় দেখতে পেলেন, দলেরই চারজন চাকর মড়ার মতো পড়ে আছে দরজার বাইরে।

চমকে উঠলেন সকলেই। হেরিকেন-হাতে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই দেখেন ঘরের মধ্যে বীভৎস কাণ্ড। কেউ পড়ে আছে ঘরের কোণে, কেউ বিছানায় শুয়ে গোঙাচ্ছে, কেউ মুখ থুবড়ে হতচেতন হয়ে পড়ে আছে ভাঙা-কাচের ওপর। ঘরের পাতা-বিছানাপত্র সব তছনছ।

রক্ষা করুন ছোটবাবু—আমাদের বাঁচান আপনি—দেখুন কি সর্বনাশ হয়েছে।—এবারে তারা দুই-তিনটেকে বোধহয় মেরেই রেখে গেছে—ঐ দেখুন তিনকড়িকে—ও বোধহয় আর বেঁচে নেই।—ঘরের সবারই আর্ত চিৎকার।

সবাই দরজার পাশে পড়ে-থাকা তিনকড়িকে ধরাধরি করে উঠিয়ে বিছানা ঠিক করে তার ওপর শুইয়ে দিলেন। জ্ঞান হারিয়েছে বেচারি! চাকর চারজনকেও ঘরে আনা হলো। তারা মৃতবৎ, অজ্ঞান। এছাড়া বেশ কয়েকজন মূর্ছা গেছে। সকলকেই শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরানো হলো। তারপর প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল তোমাদের? ঘরের জানালার শার্শিগুলোই বা এমনভাবে ভাঙলো কে?

দীননাথ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, কি আর বলবো! সবেমাত্র বিছানায় শুয়েছি, তন্দ্রাও এসেছে। হঠাৎ দেখলাম কাচের জানালাগুলো কে-যেন আঘাত করে-করে ভেঙে ফেলছে। টিমটিম করে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছিল। আমরা কাচ ভাঙার শব্দে তড়াং করে বিছানার উঠে বসেছি। জানালার দিকে লক্ষ্য পড়তেই দেখি এক-এক করে সাত-আটটা কাটা

মুণ্ডু মেঝেতে নেমে এলো। দেখেই তো আমাদের চক্ষুঃস্থির। কারুরই ওঠবার শক্তি নেই, সারা অঙ্গ অবশ। চেঁচাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ। তারপরেই দেখি কাটা মুণ্ডুগুলো মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পরক্ষণেই দেখলাম সাত-আটটা ভয়ংকর মূর্তি ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই মূর্তিগুলো দেখেই আমাদের দাঁত-কপাটি লেগে গেল। আমরা জ্ঞান হারালাম। তারপরে আর কিছু মনে নেই।

প্রিয়নাথ অভয় দিয়ে বললেন, দেখ দীননাথ, কালকের ব্যাপারটা বোধ হয় তোমরা মনে মনে আলোচনা করছিলে তাই বোধহয় তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছো!

না না ছোটবাবু, আমরা মিথ্যে বলছি না—সব সত্যি। ঐ দেখুন জানালার শার্শি সব ভাঙা। সারা ঘরে কাচের টুকরো।

ঠিক আছে, আমরা সবাই তো এসে গেছি এখানে। আজ রাত্রে সবাই একসঙ্গে থাকবো এ-ঘরে। তোমরা বিশ্রাম করো।—প্রিয়নাথের আশ্বাসে সবাই আবার বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। প্রিয়নাথও একটা বিছানা নিলেন। তাঁর মাথায় তখন একমাত্র চিন্তা, কী করে আগামীকাল 'শো' হবে। একটা দিন তো গেল। আজও যদি এভাবে রাত কাটে তাহলে কাল? কালও কি এরা শো করতে পারবে? একদিনের কী বিরাট খরচ!

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। পিথাপুরের বাংলো-বাড়িটি নিস্তব্ধ নিথর। দূরের গ্রাম থেকে কখনও কখনও ভেসে আসছে গৃহপালিত কুকুরের ডাক। বাগানের কোনো গাছের ডালে বাদুড়ের ঝট্‌পটানি শব্দ যেন নিস্তব্ধ বাতাসকেও ভেঙে খান্‌-খান্‌ করে দিচ্ছে।

'সহসা এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বজ্রধ্বনিবৎ এক ভীষণ আওয়াজ শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের উন্মুক্ত জানালাগুলি সশব্দে নড়িয়া উঠিল, এরূপভাবে একসঙ্গে সেগুলি আন্দোলিত হইয়া রুদ্ধ হইল যে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল, যেন কোনো অনৈসর্গিক উপায়ে কোনও মহাশক্তিমান্ পুরুষের অজ্ঞাত হস্তসঞ্চালনে সেগুলি কম্পিত ও আলোড়িত হইল।' সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে দাঁড়ালেন সার্কাসের মালিক প্রিয়নাথ বোস। দীননাথ ও অন্যান্যরাও আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো। সবাই হুড়মুড় করে প্রিয়নাথের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো ভয়ে।

প্রিয়নাথের বুক ধক্-ধক্ করছে। একটা ভয় যেন পা থেকে শির-দাঁড়া বেয়ে মাথা পর্যন্ত উঠে সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়ে দিল। 'এমন সময় কক্ষতলে আমার দৃষ্টি পতিত হইল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—পাঁচ-সাতটা সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড কক্ষতলে গড়াইয়া বেড়াইতেছে। সে মুণ্ডের বিকট দশনপাটি—ভীষণ ভ্রূকুটি-ভ্রূভঙ্গ—লক্ লক্ রসনা আমার হৃদয়ে মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিল—আমি পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। পদমাত্র অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম না, পরক্ষণেই আবার হৃদয়ভেদী চিৎকার! সঙ্গে সঙ্গে কি দেখিলাম—কয়েকটি সুদীর্ঘ হস্ত গবাক্ষপথে কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইতেছে, সে সকল হস্তের অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই আবার সেইরূপ মর্মভেদী চিৎকার—এবার সেই ভীষণ হস্তবিশিষ্ট কতকগুলি ভীষণ-দর্শন-মূর্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল, উন্মুক্ত দ্বারপথে তাহারা কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইল। সে ভীষণ দৃশ্যে আমি আত্মহারা হইলাম—বিশ্বসংসার আমার চক্ষুপ্রান্তে ঘুরিতে লাগিল, আমি মূর্ছিত হইয়া পার্শ্বস্থিত শয্যার উপর পতিত হইলাম।'

প্রিয়নাথের যখন জ্ঞান হলো তখন তিনি দেখলেন বিছানার পাশে তাঁর মধ্যম সহোদর মতিলাল বসে! আর সবাই প্রিয়নাথকে ঘিরে মনমরা হয়ে বসে আছে। এই রাতের চিৎকার সেদিন পিথাপুর রাজবাড়ি পর্যন্ত পেঁৗচেছে। সার্কাস-দলের অমঙ্গল-আশংকায় রাজবাড়ির কয়েকজন কর্ম-চারী একদল দারোয়ান নিয়ে রাতেই এখানে ছুটে আসেন। তাঁরা এসে ঘরের সবাইকে মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অবাক্ হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মূর্ছিত ব্যক্তিদের সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলেন। তাঁরাও সকলে বসে আছেন প্রিয়নাথের ঘরে।

এ-বাড়িতে আর না! সকাল হতেই শুরু হলো আহারাদি করার ব্যবস্থা। দুটি রাতের বিধ্বস্ত শরীর-মন নিয়ে তাঁরা আহারাদির পরেই এই ভূতুড়ে বাড়ি ত্যাগ করলেন। 'এখনও পিথাপুরের কথা উঠিলে আমাদের সম্প্রদায়ের সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।'
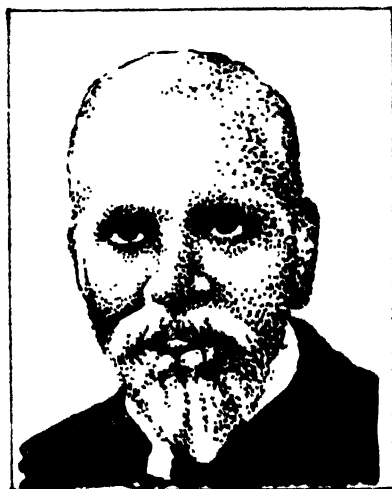
প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ভুপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর মৃত পুত্র

গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতেন বিলেতে বসে

'গত বছর আমার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। প্রথমে আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি মারা যায়। সে ছিল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। বেঁচে থাকলে সে আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করতো। এর কয়েক সপ্তাহ পরে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে বুকে শেল হেনে আমার কনিষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্রনাথ মারা গেল। আমি প্রথমবার যখন বিলেতে যাই, সেবার গিরীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গেই বিলেতে গিয়াছিল এবং তিনবছর কাল সেখানে সে আমার সঙ্গের সাথী হিসেবে ছিল। পর পর এই দুটি মৃত্যু আমাকে বজ্রাহত করে দিয়েছে। আমার হৃদয় ভেঙে যায়, আমি গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়ি।'—এ-কথাগুলো লিখেছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও জননেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯-১৯২৪) ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ২০ মে তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। ইংরেজীতে।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পৌত্র এবং কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায় ১৯২১-এ। বাংলা ১৩২৮। এরই ঠিক দু'বছর পরে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যে-দুটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখে জানান তা প্রকাশিত হয় ১৯২৩-এর ২০ ও ২৭ মে তারিখে।

বাংলার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ভূপেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্জের অনুগামী। একসময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর অশুতোষের মৃত্যুর পর কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলারও। এছাড়াও তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ছিল ভারত তথা বাংলা মায়ের চরণে নিবেদিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই বসু-পরিবার আজও তাঁদের পূর্ব গরিমা অম্লান রেখেছেন।

পৌত্র ও পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত ভূপেন্দ্রনাথ সেদিন শান্তির আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল, মৃত্যুর পরও তাঁর মৃত পুত্রের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেন।

১৯২২-এ তিনি বিলেতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর এক গণ্যমান্য বন্ধুকে অনুরোধ করলেন যেন কোনো অভিজ্ঞ পরলোকতত্ত্ব-বিদের সঙ্গে তাঁকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। বন্ধুটির সাহায্যে হামস্টেড-নিবাসী কর্নেল কাওলে নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হলেন ভূপেন্দ্রনাথ। কর্নেল কাওলেই তাঁকে নিয়ে গেলেন মিসেস্ জনসন নাম্নী জনৈকা মিডিয়মের কাছে। ভূপেন্দ্র-নাথের নিজের জবানীতে এবার শোনা যাক ঃ

১৯২২ সালের ৮ অক্টোবর রবিবার। বিকেল ৩-৪৫ মিনিটের সময় সিয়ান্সে (scance) অর্থাৎ প্রেতাদি-গবেষকদের বৈঠকে বসার ব্যবস্থা হলো। ঠিক সময়ে আমার বন্ধু মিস্টার এন. সি. সেন কর্নেল কাওলের সঙ্গে মিসেস্ জনসনের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুলাম। ভদ্রমহিলা আধা-বয়সী ও খুবই হাসিখুশি। আমরা চারজন একটি ঘরে একখানি ছোট টেবিলের চারপাশে চেয়ারে বসলাম। মিসেস্ জনসন আমার বামে, মিস্টার সেন দক্ষিণে ও কর্নেল সামনে বসলেন। দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে, পর্দা ফেলে দিয়ে, ঘরটি আবছা অন্ধকার করা হলো। আমাদের সামনে একটি চোঙ্ (trumpet) ছিল। সাধারণ গ্রামোফোনের চোঙের থেকে কিছুটা বড়।

সমস্ত বন্দোবস্ত করে মিসেস্ জনসন বললেন, একবার বসেই সব সময় কৃতকার্য হওয়া যায় না, কাজেই অকৃতকার্যতার জন্যে আমাদের প্রস্তুত

থাকতে হবে। তারপর বললেন, যদি তাঁর পরিচিত প্রেতাত্মা আসে, তাহলে চোঙ্‌টি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে এবং চোঙের ওপর টোক্কার শব্দ হলে জানা যাবে, চোঙ্‌টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সময়ে চোঙাটি ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দেহের নানাস্থানে স্পর্শ করবে। এ-থেকেই বোঝা যাবে যে, ঘরে আত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পরিচিত আত্মাটি হলো ল্যাংকাশায়ারবাসী একটি বালকের। সে খুব গান ভালোবাসে।

আমরা স্থিরভাবে বসলাম। মিসেস্ জন্‌সন গান গাইতে শুরু করলেন। আমরাও তাতে যোগ দিলাম। প্রায় মিনিট পনেরো কেটে গেল। হঠাৎ চোঙের ওপর টক্-টক্ শব্দ হতে শুরু করলো। প্রায়-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর। বুঝতে পারলাম, ঘরের চারিদিকে চোঙাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রমে আমাদের দেহের নানাস্থানে এসে চোঙাটি স্পর্শ করতে লাগলো। হঠাৎ চোঙাটি খট্ করে মেঝেতে পড়ে থেমে গেল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কে-যেন মিসেস্ জন্‌সনের সঙ্গে কথা বলছে। সে-কথার উচ্চারণে ল্যাংকাশায়ারের টান।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস্ জন্‌সন আমাকে বললেন, আমি দেখছি। আপনার পেছনে একহারা দীর্ঘকায় সুশ্রী একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তার কোঁকড়া চুল এবং বয়স আন্দাজ তিরিশ বছরের হবে। তিনি আরও বললেন, তাঁর পরিচিত আত্মা বলছে, এটি আপনারই পুত্র। এখানে বলা আবশ্যক, আমার পুত্রের যে মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর সময়ে তার বয়স কত ছিল, এ-কথা আমি মিসেস্ জন্‌সন বা কর্নেল—কাউকেই জানাইনি। জন্‌সন আরও বললেন, আমার পুত্রের আত্মা আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু শক্তি না-থাকায় পারছে না। আমি ইচ্ছে করলে আমার পুত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

তখন আমি আমার মৃত পুত্রের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালো আছো তো ?

তখনই চোঙের ওপর তিনবার টোক্কার শব্দ হলো। মিসেস্ জনসন্ বললেন, এর অর্থ, হ্যাঁ, সে ভালো আছে। তিনি আরও বললেন, আমার ছেলে আমার জন্যে চিন্তিত। মিস্টার বোস, আপনার পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে। সে কিন্তু আপনার দিকে তাকিয়ে। মাথায় টাক। চিনতে পারেন কি তাকে ?

আমি কিন্তু তাকে চিনতে পারলাম না। এর পর আমার সম্বন্ধে আর কিছু হলো না।

এবার মিসেস্ জন্সন মিস্টার সেনকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কাছে একজন বেঁটে মতো কে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তার পাগড়ি ও গায়ে জরির কোট।

মিস্টার সেন চিনতে পারলেন না তাকে। মিসেস্ আবার তাঁকে বললেন, আপনার সামনে একটি যুবকের সঙ্গে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। মহিলার মাথায় ঘোমটা এবং পরিচ্ছদ একটু নতুন ধরনের। এঁরা আপনার মা ও ভাই। মহিলাটি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

বিস্ময়ে অভিভূত মিস্টার সেন। তাঁর মা ও ভাই যে পরলোকে এ-কথা তো কারুরই জানার নয়। তবে ?

এমন সময় চোঙের ভেতর থেকে মহিলা-কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিন্তু এমন অস্পষ্ট যে আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। তখন মিসেস্ জন্সন সেনকে বললেন, আপনার মায়ের প্রিয় গান কি কিছু জানা আছে আপনার ? যদি থাকে, তাহলে আপনি গানটি করুন, আপনার মা-ও আপনার সঙ্গে গাইবেন।

মিস্টার সেন তখন একটি বাংলা প্রার্থনা-সংগীত গাইতে শুরু করলেন। আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক মহিলা-কণ্ঠ বাংলায় গান গাইছেন। কথাগুলি যদিও খুব স্পষ্ট নয়, তবুও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

আমরা একঘণ্টা এই প্রেতচক্রে বসেছিলাম। এর মধ্যে আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। আমার ছেলেকে মিস্টার সেন ভালোরকম জানতেন। মিসেস্ জন্সনের বর্ণনার সঙ্গে সব কিছুই মিল আছে। এই ব্যাপারটি যে বুজরুকি নয়, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। হোটেলে ফিরে এসেই ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নোট বইতে নোট করে রাখলাম।

কিন্তু মন আমার শান্ত হলো না। প্রথম দিনে এইভাবে চক্রে বসে তৃপ্তি পেলাম না। তবে কি মৃত পুত্র গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভালোভাবে, স্পষ্টরূপে কথা বলা যাবে না ? প্রকৃতই কি সেদিন আমার পুত্রের আত্মাই এসেছিল ? আরো সন্তোষজনক প্রমাণ না পেলে আমার মন শান্ত হবে না।

তখনই আর সিয়ান্সে বসবার সময় করতে পারলাম না। কারণ পরের সপ্তাহেই জেনেভায় ইনটারন্যাশনাল-লেবার-কন্‌ফারেন্সে যোগদান করার জন্যে আমাকে ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করতে হলো।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আবার আমি লন্ডন ফিরে এলাম। এবার অন্য কোনো সুদক্ষ মিডিয়মের খোঁজ করতে লাগলাম। অবশেষে হল্যান্ড পার্কের সাইকিক সোসাইটির সেক্রেটারি মিসেস্ মেকেঞ্জির সঙ্গে পরিচয় হলো। সোসাইটির বাড়িতেই। দেখলাম, বাড়িটি লন্ডনের উত্তম পল্লীতে অবস্থিত। এখানে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা আছে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় ঠিক হলো, ২৯ নভেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটের সময় মিসেস্ কুপার নামে একজন বিখ্যাত মিডিয়মের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দেবেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে মিসেস্ মেকেঞ্জির সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন দোতলার একটি বড়ো ঘরে। সেখানে মিডিয়ম মিসেস্ কুপার বসে আছেন।

এই ভদ্রলোকের কথাই বলছিলাম—বলে মিসেস্ কুপারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েই মিসেস্ মেকেঞ্জি চলে গেলেন। দেখলাম ঘরের মাঝখানে একখানি ছোট টেবিল, তার ওপর একটি বাদ্যযন্ত্র, আর তার দুই পাশে দু'খানি মাত্র চেয়ার।

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হলো। মিসেস্ কুপারের নির্দেশে একটি চেয়ারে আমি বসলাম, দক্ষিণ দিকের অন্য চেয়ারটিতে মিডিয়ম মিসেস্ কুপার। তিনি আমার ডান হাতটি তাঁর বাম হাত দিয়ে ধরে বসলেন। মিসেসের কথামতো আমি বাম হাত দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের হ্যান্ডেলটি ঘুরিয়ে দিলাম। বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো। আমার সামনে একটা চোঙ্‌ও ছিল।

কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম বললেন, তাঁর পরিচিত এক আত্মা এসেছে। আত্মাটি একটি ইন্ডিয়ান বালিকার। একে তিনি 'নাদা' বলে ডাকেন। তিনি প্লানচেটে বসে এর আগেও অনেকবার এই 'নাদা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। আত্মাটি তাঁর খুবই অনুগত।

হঠাৎ চোঙের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে।—আপনার ভাইয়ের আত্মা এসেছে আমার সঙ্গে।

সমস্ত শরীরে আমার যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ক'রে বিশ্বাস করবো যে আমার ভাই এসেছে ?

এবার পুরুষকণ্ঠে স্পষ্ট উত্তর হলোঃ কেন, মনে নেই আমরা একসঙ্গে একবার তাজমহল দেখতে গিয়েছিলাম ?

অনেকের সঙ্গেই তো আমি বহুবার তাজমহল দেখতে গেছি।—অন্য কোনো প্রমাণ দিতে পারো ?

পারি।—বলে আমার ভাই যে-রোগে মারা গিয়েছিল সেই রোগের নাম করলো। আমি বিস্মিত হলাম। আর বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, আমি আমার মৃত ভাইয়ের চিন্তা একবারও এখানে করিনি। কারণ, বেশ কয়েক বছর আগেই সে মারা যায়। আমার শোকের বেগ ক্রমেই কমে এসেছিল। বিশেষ করে আমার ছেলে ও পৌত্রের মৃত্যুটাই আমার সমস্ত মন তখন আচ্ছন্ন করে ছিল। কি ক'রে এদের দেখবো, এদের সঙ্গে কথা বলবো, এই চিন্তাতেই আমি বিভোর ছিলাম। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার ছেলের আত্মা তো এলো না, এলো আমার ভাইয়ের !

এবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম বলতে পারো ?

উত্তর হলো প্রথমবারঃ 'ইন্দ্র'। তারপর শব্দ হলো 'হিতেন্দ্র'।

সেদিন আমার ভাইয়ের আত্মা যে নাম বললো, তা ঠিক নয়। আমার মৃত ভাইয়ের নাম 'উপেন্দ্র'। কিন্তু অন্য একটি খবরে চমকে উঠলাম আমি। আত্মা বললো, সাগরের পরপারে আমার স্ত্রীকে আমার ভালোবাসা জানাবে। তিনি ছেলেপুলে নিয়ে কলকাতায় তোমার ওখানেই আছেন।

প্রকৃতই আমার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী সন্তান-সন্ততিসহ আমাদের কলকাতার বাড়িতেই বাস করছেন তখন।

চোঙের মধ্য থেকে আবার শব্দ হলোঃ আমি এবার যাই। আবার আসবো।

সেদিনের মতো সিয়ান্সে বসা শেষ হলো। মনটা কিন্তু বিষাদগ্রস্ত। পুত্রের সঙ্গে কথা বলা হলো না। সে কেন এলো না ? আমি তো তার সঙ্গেই কথা বলতে আজ সাইকিক সোসাইটিতে এসেছিলাম। আশাও করেছিলাম, সে আসবে। কিন্তু না আসাতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এলাম হোটেলে।

বিভিন্ন কাজে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। মনটা কিন্তু অস্থির, অশান্ত। ৮ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায় আবার গেলাম হল্যান্ড

পার্কে—সাইকিক্যাল সোসাইটিতে ! সোজা উঠে গেলাম মিডিয়ম মিসেস্ কুপারের ঘরে। বললাম, আজ একবার বসতে চাই চক্রে। কুপার রাজি হলেন।

যথারীতি ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হলো। আগের দিনের মতোই আমি মিডিয়মের বাম পাশের চেয়ারে বসে তাঁর বাম হাত আমার ডান হাত দিয়ে ধরে রাখলাম। এবং বাম হাত দিয়ে বাদ্যযন্ত্রটি চালিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই চোঙের মধ্য থেকে 'নাদা'র গলার স্বর আবার শোনা গেল।—আপনার ভাই আবার এসেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আমার ভাইয়ের আত্মা যদি প্রকৃতই এসে থাকো, তাহলে তোমার নাম বলো।

এবার উত্তরটা ঠিক হলো,—আমার নাম উপেন্দ্র।

আমার মনটা ছটফট্ করছে আমার পুত্রের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। বললাম—পুত্র গিরীন্দ্রকে ডেকে দিতে পারো ?

উত্তর হলো ঃ সে এখানেই আছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমার পুত্রের আত্মা ? কেমন করে বুঝবো যে তুমিই আমার পুত্র ?

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হলো, ফাদার, হার্ট-হার্ট-হার্ট।

মিসেস কুপার তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে কি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় ?

আমি কুপারের কথার কোনো জবাবই দিলাম না। কারণ মিডিয়মকে আমার পুত্রের সম্বন্ধে কোনো কথাই জানাতে চাই না। আমাকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করতে হবে গোটা ব্যাপারটা সত্য না মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ! যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে আমি সবকিছু বিচার করে নিতে চাই।

এবার আমি আবার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কোনো প্রমাণ দিতে পারো ?

তৎক্ষণাৎ চোঙের মধ্য থেকে দু'বার ধ্বনিত হলো ঃ ১৭ই নভেম্বর —১৭ই নভেম্বর।

একথা শুনেই মিডিয়ম কুপার জিজ্ঞেস করলেন আবার, আপনার ছেলে কি ১৭ই নভেম্বর মারা গেছে ?

আমি বললাম, তারিখটা ঠিক বলতে পারবো না। কারণ আমার ধারণা ছিল ১৬ তারিখে আমার কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায়।

আবার পুনরায় আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার মৃত্যুর মাস ও বারের নাম বলতে পারো ?

উত্তর হলো ঃ শনিবার, জুন মাস।

আর কোনো প্রমাণ দিতে পারো ?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে একখানা ঘোড়ার ছবি আছে।

সবই হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর সন্দেহের কোনো কারণই নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে তুমি কেমন আছো ?

বেশ সুখে আছি।

আমাদের ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না ?

বাবা, অনেক সময়েই আমি তোমার কাছে থাকি। এখানে আমার দুই পিসির কাছে আছি। 'সেজ' এখানেই—

পিসি !—চমকে উঠলাম। আমার দুই বোন মারা গেছে। আমার তৃতীয়া বোন যাঁকে আমি 'সেজদি' বলে ডাকতাম, তিনি আমার ছেলের মৃত্যুর প্রায় একমাস আগে মারা যান। গিরীন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। গিরীন্দ্র তাঁকে 'সেজ' বলে ডাকতো। চোঙের ভেতর থেকে বাংলায় এই 'সেজ' কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

পরক্ষণেই চোঙের মধ্য থেকে আওয়াজ হলো, বাবা, শোক করো না। মৃত্যু বলে কিছু নেই, কারণ আত্মা অমর। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই কিন্তু মুখে বেশিকথা বলার শক্তি আমাদের নেই। তুমি কাগজ-কলম নিয়ে বোসো, আমি অনেক কথা তোমাকে জানাবো। বাবা, আবার যখন আসবে তখন আমার জন্যে কিছু ফুল নিয়ে এসো। ফুলের আকর্ষণে আমরা শক্তি পাই।

সেদিনকার মতো চক্র শেষ করলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আমরা সিয়ান্সে বসেছিলাম সেদিন।

বাসায় ফিরলাম। প্রথমে ডায়েরি খুলে পুত্রের মৃত্যুর তারিখটা দেখে

নিলাম। না। আমার ধারণাই ভুল। ১৬ নয়, গিরীন মারা গেছে ১৭ই জুন। বারও ঠিক—শনিবার।

এর পর থেকে কেবলই মনে হতে লাগলো, মৃত আত্মাকে ফুল আকর্ষণ করতে পারে কীভাবে? এটা পরীক্ষা করতেই হবে আমার ছেলের আত্মাকে দিয়ে। তাছাড়া ছেলের সঙ্গে কথাবলার ইচ্ছেও একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে আমাকে। কবে আবার সিয়ান্সে বসবো, কবে আবার ছেলের সঙ্গে কথা হবে—এই সব চিন্তা অন্যান্য কাজের মধ্যেও ঘুরে-ফিরে মাথায় আসতে থাকে। মাঝে-মাঝে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠি। কোনো কাজেই মন বসাতে পারি না।

মাঝে দুটো দিন গেল। ১১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় আবার সিয়ান্সে বসার ঠিক হলো। ঠিক সময়ে ইন্ডিয়া অফিস থেকে রওনা হলাম। রাস্তায় কিছু চন্দ্রমল্লিকা ফুল কিনলাম। এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মিডিয়ম মিসেস্ কুপারের ঘরে গিয়ে পেঁছুলাম।

মিডিয়মের নির্দেশে ফুলগুলি প্রেতচক্রের বেশ কিছুটা দূরে রেখে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

কয়েক মিনিট পরেই প্রথমে পূর্ব প্রেতাত্মা 'নাদা'র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। চোঙের মধ্যে থেকে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর—তোমার সামনে একটা সুন্দরী রমণী দাঁড়িয়ে আছে।

ইনি যে কে, আমি তা ভেবে স্থির করতে পারছিলাম না। এমন সময় নাদা বললো—মেয়েটি আপনার কন্যা। তার সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলেও আছে।

তখনই মনে পড়লো, তেরো-চৌদ্দ বছর আগে কলকাতায় বেরিবেরি রোগ মহামারী আকার ধারণ করেছিল। সেই রোগে আমার একটি কন্যার মৃত্যু হয়। সে দুটি শিশু সন্তান রেখে যায়। কিন্তু কনিষ্ঠ সন্তানটি এর কিছুদিন পরেই মারা যায়।

আমি তখন আমার কন্যার আত্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তোমার নাম বলতে পারো?

না, পারি না।—উত্তর হলো, আমার নাম ইংরেজির ছয় অক্ষরে—শেষ অক্ষর 'লা'।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কন্যা Susila (সুশীলা)-কে মনে পড়লো। ছটি

অক্ষরই বটে। কিন্তু মনে কেমন যেন সংশয় জেগে উঠলো, আত্মা এত কথা বলছে অথচ নিজের নামটি বলতে পারছে না ? এ কেমন কথা ? এর ব্যাখ্যা কি ?

চিন্তা করলাম, ঠিক আছে, আরও পরীক্ষা করবো। জিজ্ঞেস করলাম, অন্য কিছু নিদর্শন দেখাতে পারো ?

আত্মার উত্তর হলো ঃ 'বাইশ'।

এই 'বাইশ' শব্দটিতে প্রথমে কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। কি বলতে চাইছে আত্মা ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সুশীলা মারা গেছে বাইশ বছর বয়সে। সেই কথাই সে বলছে কি ! বোধহয়।

আমি যখন এখানে আসি তখন অন্য কারো কথাই মনে হয়নি। একমাত্র পুত্র ছাড়া আর কারো কথাই মাথায় ছিল না। অথচ সেই পুত্র আজ এলো না কেন ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার ছেলের আত্মা কি ওখানে আছে ?

তখন চোঙের ভেতর থেকে আমার ছেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—হার্ট, হার্ট, হার্ট।

খুব ভালো লাগছে আমার। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জড়দেহ ধারণ করে আমাকে দেখা দিতে পারো বা আমাকে স্পর্শ করতে পারো ?

সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে কয়েকটি আঙুলের স্পর্শ অনুভব করলাম। সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। আত্মা বললো, বাবা, তুমি দেখতে পাও, এমন ভাবে দেহধারণ করার শক্তি আমার নেই।

বললাম, তোমার জন্যে ফুল এনেছি। ঐ ফুল কি তুমি আমার হাতের মধ্যে এনে দিতে পারো ?

সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠোর মধ্যে একটু ফুলের পাঁপড়ির স্পর্শ পেলাম। চক্র শেষ হলে দেখলাম, আমি যে চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ ঘরে এনে রেখেছিলাম, তার থেকে একটা ফুল ছেঁড়া এবং সেই ছেঁড়া ফুলটি আমার হাতের মুঠোয়।

মানসিক প্রশান্তি নিয়ে লন্ডন ছাড়লাম ২১ ডিসেম্বর। ৮ জানুআরিতে কলকাতায় পেঁছুলাম। সেই স্মৃতির কথা আজ লিখে জানালাম।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার পরলোকের অনেক কথা জেনে নিয়েছিলেন জানকীনাথ বসু ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মার কাছ থেকে

গিরীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা সাহিত্যে স্বল্প-পরিচিত হলেও ভূপর্যটক হিসেবে তাঁর নাম অনেকেরই জানা। তিনি বহুকাল ব্রহ্মদেশে কাটিয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশই তাঁর ঘোরা। ব্রহ্মপ্রবাসে থাকতেই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র-সম্বন্ধীয় স্মৃতি-কথার অপূর্ব ফসল তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র'। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্যে পূর্ণ এই ৩৫৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি।

গিরীন্দ্রনাথের পুত্র সন্তোষময় তখন দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা-পীঠে পড়তো। সেখানে একটি বেলগাছ থেকে পড়ে গিয়ে ভূতাবিষ্ট হয়ে যায়। এবং একই সময়ে পুরীর 'রাধানিবাস'-এ গিরীন্দ্রনাথের কন্যা কমলার ওপর অলৌকিক দৈবশক্তি ভর করে। কমলার অত্যাশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি, দূরশ্রবণ, দিব্যদর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখে পুরীর সকলেই বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়েন। গিরীন্দ্রনাথ অনেক ডাক্তার-কোবরেজ আনালেন।

অনেক ওষুধপত্র, ঝাড়ফুঁক, কবচ-মাদুলি করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী বললেন, 'রাম' নামে ভূত পালায়। দেখা যাক একাদশীর দিন নামসংকীর্তন করে।

তাও হলো। ওমা! কমলাও যে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নামকীর্তন করছে। কোথায় ভূত পালাবে, তা নয় তো ভূতের মুখে রামনাম!

চারিদিকে এ-সংবাদ লোকমুখে প্রচার হয়ে পড়লো। কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়লো এই অলৌকিক ব্যাপার।

এরপর সপরিবারে ফিরে এলেন গিরীন্দ্রনাথ কলকাতায় কালীঘাটের বাড়িতে।

শরৎচন্দ্রের কানেও এ-সংবাদ এসেছে। তাঁর বন্ধুর পুত্র-কন্যার ঘাড়ে ভূত চেপেছে শুনে তিনি এলেন গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। কালীঘাটে। বললেন, হ্যাঁগো গিরীন, কি শুনছি? তুমি শুধু বিলেত ফেরত নও, দুনিয়া-ফেরত লোক, তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

গিরীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, এখন ভূত আমার পুত। শরৎদা, আমি আজ বছর পাঁচেক থেকেই ভূতের বাবা সেজে বসে আছি। এ আবার যে-সে ভূত নয়, বেলগাছের ব্রহ্মদত্যি!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, কমলার ব্যাপারটা কি?

ও-সব অতীন্দ্রিয় (Supernatural) শক্তির খেলা।

শরৎচন্দ্র বললেন, ঘটনাটি আমি যা শুনেছি, চোখে না দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না বলে তোমার কাছে শুনতে এসেছি।

তুমি শুনলে কোথা থেকে? সে-সময় সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন ছাড়া আর তো কেউ কলকাতার লোক আমার ওখানে ছিলেন না!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, যারা ঘটনাগুলো চোখে দেখেছে তারা কি সবাই পুরীর লোক?—ভূতে-অবিশ্বাসী শরৎচন্দ্রের কেমন যেন সন্দেহ-ভরা চোখ।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, না। সবাই পুরীর লোক কেন হবে? সেখানে ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বাপ-মা, পাটনা হাইকোর্টের জজ রায় বাহাদুর অমরনাথ চ্যাটার্জি, পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মন্মথনাথ বসু, লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, রায়সাহেব

উপেন্দ্রনাথ দে, সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেন—এঁরা সবাই কমলার ভৌতিক কান্ডকারখানা দেখেছেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, এ খবরগুলো খবরের কাগজে দিচ্ছ না কেন?

কি হবে সাধারণের কাছে প্রকাশ করে?—গিরীন্দ্রনাথ বললেন।

হয়তো কিছুই হবে না,—শরৎচন্দ্র বললেন, এমন লোকও তো ঢের আছে যারা এই অলৌকিক কথাগুলো শুনলে গবেষণা করবার সুযোগ পেত।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, আজ সকালে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পরলোকতত্ত্ববিদ্ মিস্টার ভি. ডি. ঋষি ও তাঁর স্ত্রী কমলাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা সব দেখে-শুনে বললেন, There are more things bteween Heaven and Earth than dreamt in your philosophy. তিনিও এই ঘটনাগুলো তাঁর 'স্পিরিচুয়াল বুলেটিন'-এ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন. কিন্তু আমি নিষেধ করেছি।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ ঋষি লোকটি কে?

গিরীন্দ্রনাথ ঋষির পরিচয় দিলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। তিনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, বি. এ, এল. এল. বি.। ১৯১৯-এ তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর অকাল বিয়োগে ভদ্রলোক খুবই আঘাত পান। জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য, দেহ নষ্ট হলেও আত্মা অবিনশ্বব—এসব কথা তিনি জানেন। কিন্তু শান্তি কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সব আধুনিক গবেষণা চলছে তার সন্ধান নিলেন। অনেক বইপত্র পড়লেন। স্যার অলিভার লজ-এর বই থেকে তিনি জানতে পারলেন, মৃত্যুর পরেও আত্মা বর্তমান থাকে। ১৯২০-তে মিস্টার ঋষি আবার বিয়ে করেন।

এরপর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে দারুণ মেতে ওঠেন। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। চলে গবেষণা। এখন এঁরা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে পরলোকতাত্ত্বিক হিসাবে এঁদের জুড়ি নেই। এঁরা দুজনেই ভালো মিডিয়ম। তাঁর সঙ্গে প্লানচেটে বসলে নিমিষের মধ্যে যে-কোনও অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথা-বার্তা বলা যায়। এমন কি তাদের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাওয়া যা, ছায়ামূর্তিও দেখা যায়।

বলো কি ? তুমি এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছো ?—শরৎচন্দ্রের বিস্ময় !

নিশ্চয়ই—গিরীন্দ্রনাথ বললেন, আমি, আমার বন্ধু রায়সাহেব হরিসাধন মুখার্জি, মিস্টার ও মিসেস্ ঋষি এই চারজনে একদিন সারকেলে বসি। মিস্টার ঋষি শান্তভাবে ইংরেজীতে একটি সুন্দর প্রার্থনা করার পর আমার হাতে কাগজ-পেন্সিল দিয়ে পরলোকগত কোনো পবিত্র আত্মার চিন্তা করতে বললেন। আমি কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে আমার আত্মীয় সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীবাবুর মূর্তির ধ্যান করি।

সুভাষদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে ?—জিজ্ঞেস করলেন শরৎচন্দ্র।

হ্যাঁ, আছে। আমার স্ত্রী সুভাষচন্দ্রের মায়ের সম্পর্কিত খুড়তুতো বোন। জানকীবাবু আমার ভায়রাভাই হলেও আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। পুরীতে পাঁচ বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি।

তারপর ?—শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসা।

আমরা যে টিপয়টাকে নিয়ে টেবিলে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি তার একটি পায়া শূন্যে উঠে বার-বার শব্দ করছে। বুঝলাম আত্মা এসেছে।

আমিই প্রশ্ন করলাম, কে আপনি ? নাম কি আপনার ?

উত্তর হলো ঃ জানকীনাথ বসু।

প্রশ্ন ঃ আপনি এখন কোথায় আছেন ?

উত্তর ঃ সপ্তম স্তরে।

প্রশ্ন ঃ কেমন আছেন ?

উত্তর ঃ বেশ সুখে আছি।

প্রশ্ন ঃ আমি কে বলুন তো ?

উত্তর ঃ গিরীন্দ্র।

এই সময়ে মিস্টার ঋষি বললেন গিরীন্দ্রনাথকে, take proper identity of your relative,

পুনরায় প্রশ্ন করলেন গিরীন্দ্রনাথ ঃ কোথায় আপনার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলতে পারেন ?

উত্তর হলো ঃ পুরীতে।

প্রশ্ন ঃ এমন দু' একটি ঘটনার কথা বলুন যা থেকে সঠিক বুঝতে

পারবো যে, আপনিই স্বর্গীয় জানকীনাথ, অপর কোনো আত্মা নয়।

উত্তর ঃ তুমি একবার অসুখের সময় একজন ডাক্তার, কিরণ ও তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার দিদিকে পুরী থেকে কটকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আর একবার মন্মথবাবুর বাড়ির গীতা ক্লাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তুমি ইজিচেয়ারে শুইয়ে কাঁধে করে আমায় 'জগন্নাথধামে' এনেছিলে।

শরৎচন্দ্র অবাক্-বিস্ময়ে গিরীন্দ্রনাথের সব কথা শুনছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারটি জেনে নিলে না কেন?

জেনেছিলাম—গিরীন্দ্রনাথ বললেন, জানকীবাবুর আত্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনার সন্তোষময়কে মনে আছে?

উত্তর পেলাম—খুব মনে আছে, তোমার ছোট ছেলে।

প্রশ্ন ঃ তার ঘাড়ের ভূত এখনও ছাড়েনি, কবে ছাড়বে বলতে পারেন?

উত্তর ঃ সেই স্পিরিটকে জিজ্ঞেস কর।

শরৎচন্দ্র জানতে চাইলেন মিস্টার ঋষির ঠিকানা।

গিরীন্দ্রনাথ বললেন, উনি এখন ভবানীপুর মহারাষ্ট্র ক্লাবে আছেন। বছরে একবার করে কলকাতায় আসেন।—বলে ঋষির বোম্বের ঠিকানাটাও শরৎচন্দ্রকে দিলেন।

মিস্টার ঋষির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় ১৯৩৭-এর ৯ মে, গিরীন্দ্রনাথের বন্ধু শচীন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে। তখন শরৎচন্দ্র অসুস্থ। সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন ঋষির বক্তৃতা-সভায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের জজ দ্বারিকানাথ মিত্র এবং বহু মাননীয় ব্যক্তি। সেখানে মিস্টার ঋষির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বহু আলোচনা হয় আত্মা বা Spirit নিয়ে। ওঁর ইচ্ছা ছিল এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে স্টাডি করার। কিন্তু সে-সময় আর তিনি পারেননি। ১৯৩৮-এর ১৬ জানুআরি, বেলা ১০টায় পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

অসুস্থ শরীর নিয়ে শয্যাশায়ী শরৎচন্দ্র একদিন গিরীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, যৌবনের প্রচণ্ড তেজে এই জগতকে যে-চোখে দেখেছি, এখন যাবার সময় ঠিক তার বিপরীত ভাব! ভাই, বিছানা না নিলে এ পৃথিবীটা যে কি তা ঠিক ঠিক বোঝা যায় না।

এ-হেন মরমী কথাসাহিত্যিক, নাস্তিক শরৎচন্দ্র, প্রেতাত্মায় অবিশ্বাসী শরৎচন্দ্র মারা যাবার বেশ কয়েক দিন পর গিরীন্দ্রনাথ চক্রে বসলেন শরৎ-চন্দ্রের পরলোকগত আত্মার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে। সঙ্গে নিলেন গভর্নমেন্ট ফাইনান্স বিভাগের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার ও কলকাতা সাইকিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট রায় সাহেব হরিসাধন মুখার্জিকে। মিডিয়ম হলো একটি বালিকা। ওঁদেরই জানাশোনা।

শরৎচন্দ্রকে গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ওঁরা দু'জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা অনুভব করলেন প্রেতাত্মা ভর করেছে মিডিয়ম মেয়েটির ওপর।

প্রথমেই প্রশ্ন করলেন গিরীন্দ্রনাথ, যদি কোনো আত্মার আবির্ভাব হয়ে থাকে, তাহলে নাম জানান।

বোর্ডের কাগজে লেখা হলো : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আবার প্রশ্ন : শরৎদা, কেমন আছো ওখানে ?

উত্তর : এখানে সুখশান্তি অনির্বচনীয়।

প্রশ্ন : তুমি কবে জড়দেহ ত্যাগ করেছো ?

উত্তর : ১৬ জানুআরি, ১৯৩৮ সাল।

প্রশ্ন : সেদিন কি বার ছিল, বলতে পারো ?

উত্তর : পারি। সেদিন ছিল রবিবার।

প্রশ্ন : তুমি কোথায় মারা গেছ, বলতে পারো ?

উত্তর : পার্ক নার্সিং হোমে।

প্রশ্ন : তোমার আত্মীয়-স্বজন কে কে আছে ?

উত্তর : স্ত্রী, ভাই, ভগিনী ও ভাইপো।

এবার রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো এখানে নাস্তিক ছিলেন, এখন কি মনে হয় ?

উত্তর হলো : এখন মতের পরিবর্তন হয়েছে। একটা জন্ম বৃথা কাটিয়েছি, আপশোষ হয়। এখন বুঝেছি জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ করা।

প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব : আপনি তো বেশ গুছিয়ে মানুষের মনের কথা লিখতে পারতেন, এখন পরলোক সম্বন্ধে সবকথা একটু গুছিয়ে বলুন না !

উত্তর ঃ এখানে চৈতন্যসাগরে ডুবে আছি। আকাশ-বাতাস সবই চৈতন্যময়। জড় বলে কোথাও কিছু নেই। একই চৈতন্যশক্তি জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে বিদ্যমান।

শরৎচন্দ্রের অনুজকল্প সুহৃৎ গিরীন্দ্রনাথ হঠাৎ শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। অন্তরঙ্গ সুহৃদের বিয়োগ-ব্যথা বোধ করি নতুন করে তাঁকে আশ্রয় করেছে। মনে পড়লো তাঁর ব্রহ্মদেশে বসে রচনা করা তাঁরই একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র ঃ

জানিনা জানিনা আমি কোথা আছ তুমি,
হে অজ্ঞাত, হে অনন্ত, অচিন্ত্য রহস্য!
ধারণা করিতে তোমা শক্তি নাই মম ;
লীলাময় তুমি, না জান কি খেলা প্রভু
খেলিছ, বিরলে বসি শিশুটির মত
আপনাতে আপনি ভুলিয়া! কি কারণে
এ মহা অপূর্ব-সৃষ্টি রচনা তোমার!
অনন্তকালের সিন্ধু কল্লোলিয়া চলে
পুরোভাগে ; আমরা বসিয়া তার কূলে
করিতেছি খেলা, বিজ্ঞান-দর্পিত শিশু
বাহুবলে জ্ঞানহীন।

বিপ্লবী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্রকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মা

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯)। বরিশালের প্রখ্যাত জননেতা। ব্রিটিশের কবল থেকে মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রতিজ্ঞায় যুবসমাজকে ডেকে তিনি সেদিন বলেছিলেনঃ We want a warior class and not a race of shop-keepers in Bengal. সে-যুগটা ছিল বাংলার অগ্নিযুগ। ইংরেজ সরকারের পুলিশ যে-দিন তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে লাঠির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল, সে-দিন তিনি তাঁর আহত পুত্রকে সভার সামনে রেখে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাংলার জনগণকে লক্ষ্য করে।—আমি চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, তাতে যদি আমার পুত্রের মতো হাজার-হাজার পুত্রকে স্বাধীনতার আগুনে আহুতি দিতে হয়, সে-আগুনের ইন্ধন যোগাতে বাংলার কোনো বাপ-মাই পিছু হটবেন না।

১৯০৮-এ মনোরঞ্জন 'স্বদেশী ডাকাত' সন্দেহে জেলে গেলেন। রেঙুনের কাছে ইনসেইন জেলে তাঁকে আটকে রাখা হলো দু' বছরেরও ওপরে। জেলে বসে তিনি ডায়েরি লিখতেন। পরবর্তীকালে সে-ডায়েরি

ছাপা হয়ে প্রকাশিত হলো 'নির্বাসন-কাহিনী' নামে। প্রেতচর্চার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের কথা জানিয়েছেন এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে। এ-ছাড়াও তাঁর 'আশা-প্রদীপ' গ্রন্থ প্রেতচর্চার বহু ঘটনায় পরিপূর্ণ। 'মনোরমার জীবন-চিত্র' তাঁর আত্মস্মৃতি। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'প্রেততত্ত্ব' শিরোনামে একটি অধ্যায় পড়ে জানতে পারি, বরিশালে প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানের মূল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই পরলোকবাসীদের দেখতে ইচ্ছে হতো তাঁর। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এই জড়দেহ ত্যাগের পরে একটি প্রেতদেহ থাকে। সেই দেহ ধারণ করে পরলোকবাসিগণ আমাদের দেখা দিতে পারে, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে পারে।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিব্যক্তি কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর 'নির্বাসন-কাহিনী'তে। তিনি বলছেন, 'আটমাস কাল প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পরকালদর্শনের জন্য মনের মধ্যে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রেততত্ত্বের অনুসন্ধানে বাল্যকাল হইতেই আমি জীবনের অনেক কাল ব্যয়িত করিয়াছি। এই নির্জনবাসে হৃদয়ের গুপ্ত ভাবগুলি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক সময় মনে হইত, ইহকাল পরকালের মধ্যবর্তী পর্দাটি যেন অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। দুইখানি নৌকায় দুই দল আরোহী কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছে, অতি নিকটে থাকিয়াও একজন অন্য দলকে দেখিতে পাইতেছে না!'

অপূর্ব উপমা। একই নদীতে এক নৌকোয় পরলোকবাসী, অন্য নৌকোয় ইহলোকের অধিবাসীরা। খুব কাছাকাছি। মাঝখানে শুধু একটা অস্বচ্ছ কুয়াশার পর্দা। উভয় উভয়কেই দেখছে, কিন্তু ডিটেলস্-এ নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ একটা ছায়া।

মনোরঞ্জন প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও পরবর্তী কালে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (১৮৪১-১৮৯৯) কাছে। গুরুর ইঙ্গিতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম থেকে দূরে সরে থাকেন।

স্ত্রী মারা গেছেন মনোরঞ্জনের। মুঙ্গের জেলার এক অরণ্য-প্রদেশে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন তিনি। অভাবের সংসার। ফরিদপুরের বাসায় তখন পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ বড়ো সংসার মনোরঞ্জনের। এর ওপর আছে তাঁরই পুত্র-তুল্য এক সঙ্গী। বরিশালের

ছেলে। বেণীমাধব দে। এই ছেলেটি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে তার হিন্দু বাবা-মা তাকে বাড়িতে স্থান দেননি। সেই থেকে বেণীমাধব মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার আশ্রয়ে। মনোরঞ্জনের স্ত্রী মনোরমাও বেণীমাধবকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেছেন।

হঠাৎ মনোরঞ্জন চিঠি পেলেন ফরিদপুর থেকে—কনিষ্ঠ পুত্র দেবরঞ্জন গুরুতর অসুস্থ। মুঙ্গের থেকে ছুটে এলেন তিনি। দেখলেন, জীবনের আর আশা নেই দেবরঞ্জনের। স্থানীয় ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে। কিন্তু কোনো সুফলই পাওয়া যায়নি।

সকলের নিশ্চিত ধারণা, ছেলে বাঁচবে না। যকৃৎ ও পিলেতে পেট ভরে গেছে। শরীর থেকে জ্বরও ছাড়ছে না। সকল রকম চিকিৎসা বিফল হয়েছে।

মনোরঞ্জনের চতুর্থ পুত্র তখন সাত বছরের। এই বয়সে মাতৃহারা হওয়া যে কত বড়ো দুঃখের তা মনোরঞ্জন উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু কীই-বা করার আছে? বিদেশে তাঁকে থাকতেই হবে চাকরির জন্যে।

বালক যোগরঞ্জন মায়ের জন্যে কাঁদে। বাড়ির অদূরে এক আমগাছের নিচে প্রায় সারাক্ষণ বসে কেঁদে-কেঁদে মাকে ডাকে—ওমা, তুমি আমাকে দেখা দাও! কোথায় তুমি? তুমি কি আমাকে আর কোনো দিনই কোলে নেবে না?

হায় রে, অবোধ শিশু! চোখের জল তার চোখেই শুকোয়। মা যে তার মারা গেছে, কোনো দিনই যে মা আর আসবে না—একথা যোগরঞ্জন বুঝতেই পারে না।

বেশ কয়েকটা দিনই এভাবে কেটে গেছে যোগরঞ্জনের।

সেদিন ঠিক দুপুর। যোগরঞ্জন স্থির হয়ে বসে আছে আমগাছের নিচে। উদাস দৃষ্টি তার দূরে আমবাগানের দিকে।

হঠাৎ তার চোখদুটি আটকে গেল একটা ছায়ামূর্তির প্রতি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে সেই ছায়া। যতই এগুচ্ছে, পরিষ্কার হচ্ছে মূর্তিটি। লাল-পেড়ে শাদা খোলের একখানি কাপড় পরা। মহিলা মূর্তি।

মা !—বিস্ময়ে লাফ দিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে ধরতে গেল যোগরঞ্জন তার মাকে।

মূর্তিটি একটু সরে গেলো। ধরতে পারলো না সে।

আবার ছুটে গেল যোগরঞ্জন তার মায়ের ছায়াকে ধরতে।

এবারও ধরা গেল না। কিন্তু কৈ? আর তো দেখা গেল না মাকে। না, ছায়াও নয়।

মিলিয়ে গেছে মনোরমার বিদেহী আত্মা আদরের শিশুপুত্রকে ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই।

বাড়ি ফিরলো যোগরঞ্জন। প্রথম বললো তার বেণীকাকাকে। তারপর বাবা মনোরঞ্জন জানলেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুটোই দুলছে এঁদের মনে।

বেণীমাধব সব শুনে বললেন, এবার দেখা হলে তোর ভাইয়ের অসুখ কিসে সারবে জিজ্ঞেস করিস তো !—পরীক্ষা করতে চাইলেন বেণীমাধব যোগরঞ্জনের কথাকে।

পরের দিন যথারীতি গিয়ে বসেছে যোগরঞ্জন আমগাছের নিচে। চিন্তা করছে মাকে। আজ আসবে তো তার মা? মনে মনে বলছে, মাগো, তুমি ভাইয়ের অসুখ ভালো করে দাও। ভাই বোধহয় বাঁচবে না।

হঠাৎ দেখতে পেলো সে, তার মা আবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অস্থির হয়ে উঠলো যোগরঞ্জন।—ও মা, তুমি এসেছো? বেণীকাকা বলেছে, তুমি ভাইকে ভালো করে দাও। ওমা, তুমি বাড়ি যাবে না? ভাইকে দেখতে যাবে না?

কেঁপে উঠলো মায়ের ঠোঁট দুটি। শুনতে পেল যোগরঞ্জন, তার মা বলছে—আমাদের বাড়ির সামনে যে কাঁচা রাস্তা, সেখানে দেবকে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় বেড়ালে সে সেরে উঠবে।—বলেই মায়ের ছায়া বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এক ছুটে বাড়ি এলো যোগরঞ্জন। আনন্দে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল। হাঁপাতে-হাঁপাতে সব বললো তার মায়ের কথা।

শুনে সকলেই বিস্মিত। দেবরঞ্জনকে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় বেড়ালে কি সেরে উঠবে এই মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে?

বেণীমাধব বললে, চেষ্টা করতে আপত্তি কি?

কিন্তু এত ভীষণভাবে অসুস্থ ছেলেকে কোলে করে বেরুবে কি করে?

তবুও চেষ্টা। বুকের মধ্যে রুগ্ণ ছেলেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, মাথাটা কাঁধের ওপর ফেলে বিকেলে বেরিয়ে গেল বেণীমাধব। প্রায় আধ ঘণ্টা পায়চারি করলো রাস্তায়।

পরের দিন আবার ভোরে।

এইভাবে চললো সাত-আট দিন। সকলেরই যেন মনে হতে লাগলো দেবরঞ্জন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

ডাক্তারকে আবার ডাকা হলো। তিনি শুনে এবং রোগী দেখে বললেন—মিরাক্‌ল্‌। এ রোগীকে বাঁচানোর সাধ্য কোনো ডাক্তারেরই ছিল না। এর আর ওষুধের প্রয়োজন নেই। অলৌকিক উপায়েই দেবরঞ্জন সেরে উঠবে।

এরও একমাস পরে। মনোরঞ্জন চলে গেছেন তাঁর কর্মস্থলে—মুঙ্গেরে। মনটা তাঁর অনেকটা শান্ত। পরলোকগতা স্ত্রীই দেবরঞ্জনকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। মনোরমার বিদেহী আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তাঁর হৃদয়।

বেণীমাধব বাড়িতে আছে। ছেলেদের দেখাশোনা করে। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেণীমাধব অসুস্থ দেবরঞ্জনের ঘরে ঢুকেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মশারির মধ্যে বিছানার ওপর রুগ্ণ ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন মা মনোরমা।

দেবু—বলে চিৎকার করে উঠলো বেণীমাধব। ছুটে গিয়ে মশারি তুললো। না। মনোরমার কোনো চিহ্নই নেই সেখানে। দেবরঞ্জন বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাকে ঘুম থেকে জাগালো বেণীমাধব। দেবরঞ্জনের ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরে বেণীমাধবকে জিজ্ঞেস করলো, মা কোথায় গেল কাকু? আমায় যে কোলে নিয়ে বসেছিল মা!

কোনো উত্তর নেই বেণীমাধবের মুখে। সে-রাত্রে আর ঘুম এল না তার।

কলকাতার মেডিক্যাল হাসপাতালেও প্রেতাত্মার

মুখোমুখি হন ডাক্তার সেন

১৯৩৭-এর মার্চ মাস। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে এক রোগী ভর্তি হলো। বয়স তার সাত-আট। বাচ্চা ছেলে। অপূর্ব দেখতে। স্বাস্থ্যও খুব ভালো। রোগ ধরা পড়েছে। ডিপথিরিয়া।

ধনীর একমাত্র দুলাল বাপ-মায়ের চোখের মণি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ধারে-কাছে তাদের বাড়ি। বাবা এসে স্পেশাল কেবিন বুক করে ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন হাসপাতালে। অর্থের জন্যে কোনো চিন্তা নেই। ছেলেকে সুস্থ করতেই হবে। মোটা টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুজন অভিজ্ঞ নার্সকেও সেই কেবিনে রাখা হলো। দিবা-রাত্র। এযেন রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা, / আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরী / মূল্যে যার অসম্মান* সেই শক্তি করি চুরি / পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।'

অভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা চলছে। গলা প্রচণ্ডভাবে ফুলে গেছে। খাদ্যনালী ফুটো করে নল ঢুকিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেলেটি বোধ হয় বাঁচবে না। আবার মনে

হয় বেশ সুস্থ হয়ে উঠছে সে। ডাক্তারের নির্দেশ মতো চিকিৎসা ভালোই চলছে।

বিপদ হলো তার মাকে নিয়ে। তিনি প্রায় সব সময়েই তাঁর রুগ্ণ ছেলেকে দেখতে আসেন। হাসপাতালের নিয়মকানুন যেন তাঁর কাছে কিছুই নয়। এ-পাড়াতেই বাড়ি। ফলে হাসপাতালও যেন তাঁর কাছে নিজের ঘরবাড়ি। কিন্তু এ-ভাবে তো চলে না। নতুন হাউস-ফিজিসিয়ন এসেছেন এই ওয়ার্ডে। ডাক্তার সেন। হাসপাতালের শৃঙ্খলা-রক্ষায় বদ্ধপরিকর। তিনি একদিন দোতলায় সিঁড়ির দারোয়ানকে ডেকে বললেন, এ-সব চলবে না। ভদ্রমহিলাকে বলে দিয়ো, হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী ঠিক সময় মতো তাঁর ছেলেকে দেখে যেতে। অন্য সময়ে অ্যালাউ করবো না।

পরের দিন রোগীর মা আসতেই দারোয়ান ডাক্তার সেনের নির্দেশের কথা জানালো। বললো, আপনি আর অসময়ে আসতে পারবেন না এখানে। বিস্মিত মা জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার সেন এখন কোথায়? তাঁর কাছে যাবো।

সন্ধের পর তাঁর ডিউটি। তখন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন আপনি—সাফ জবাব দারোয়ানের।

সেই দিনই ঠিক সন্ধের পরই এলেন রোগীর মা। দেখা করলেন ডাক্তার সেনের সঙ্গে। দুটি হাত জোড় করে তিনি ডাক্তার সেনকে অনুনয় করলেন, ডাক্তারবাবু, আমার একমাত্র পুত্র। আজ সে মরণশয্যায়। যাকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারি না, তার কাছে আসার অনুমতি না দিলে বাঁচবো না।—মায়ের চোখ জলে ভরা।

ডাক্তার সেন অসুবিধায় পড়লেন। সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ ক'রে মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে হাউস-ফিজিসিয়ন রূপে বদলি হয়েছেন। মানবিক দিক্‌গুলি তখনও তাঁর পুরোপুরি ভোঁতা হয়ে যায়নি। একদিকে স্নেহাতুর মায়ের চোখের জল, অন্যদিকে হাসপাতালের নিয়মকানুন। বেশ বিপদেই পড়লেন তিনি। এর আগে তাঁর মনে হয়েছিল, দারোয়ান বুঝি কিছু টাকাপয়সা ঘুষ নিয়ে অসময়ে ভদ্রমহিলাকে উপরে উঠতে দিত। কিন্তু না, আজ তাঁর মনে হলো, স্নেহময়ী জননীর বুকের ব্যথা উপলব্ধি করেই দারোয়ানরা তাঁকে উপরে উঠতে দিত সময়ে-অসময়ে। মানুষ যে কত অসহায়,—ধনীর গৃহিণী এই ভদ্রমহিলাকে দেখে ডাক্তার

সেনের উপলব্ধি দৃঢ় হলো। তিনি বললেন, বেশ, আপনি আসবেন, কিন্তু প্রতিদিন নয়। মাঝে-মধ্যে। প্রতিদিন আসতে হলে সময় মতোই আপনাকে আসতে-যেতে হবে।

ডাক্তার সেন দারোয়ানকে ডেকে ভদ্রমহিলার সামনে একথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ দেখে মনে হলো তিনি এতে খুশি নন। অগত্যা নিরুপায় হয়েই অখুশি মনে ভদ্রমহিলা বিদায় নিলেন।

অনেকেই আপনারা দিনের হাসপাতাল দেখেছেন। গভীর রাতের হাসপাতালের ভেতরের চেহারাটা দেখেছেন কি? দেখেননি। নিথর-নিস্তব্ধ গভীর রাতে ডিম-লাইটের মায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট আলোয় বেডের শাদা চাদরঢাকা-রোগীগুলিকে যেন মনে হয় কোনো অশরীরী-লোকের বাসিন্দা। কোনো বেড থেকে উঠছে রোগীর যন্ত্রণাকাতর অস্পষ্ট আর্তনাদ, আবার কোনো বেড থেকে ভেসে আসছে ক্লিষ্টকণ্ঠে আওয়াজ—বাবা গো, বাবা গো! যাঁরা এই সময়ে ডিউটিতে থাকেন—নার্স, ডাক্তার, অ্যাটেনডেন্টস্ সবাই যেন এক মায়াময় ঘোর-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে নার্স-ডাক্তারের জুতোর খট্‌খট্ আওয়াজ, নিদ্রাজড়িত সহকারীদের গম্ভীর গলার ফিস্‌ফিসানি স্বর এক অলৌকিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ডাক্তারের নিজের কথায়ঃ 'আলোর মধ্যে সাহস আছে, নিবিড় কালো অন্ধকারের মধ্যে স্নিগ্ধতা আছে। কিন্তু আলোও নয়, অন্ধকারও নয় এমন একটা অস্পষ্টতার বিভীষিকা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি অপরের কথায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মৃদু ইলেকট্রিক আলোর ম্লান জ্যোতিতে নানাবিধ ছায়া দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে, কোন কোনওটি ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বিস্তৃত প্রকোষ্ঠের দূর প্রান্ত হইতে একটি রোগীর চাপা শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে। আজ সকালে এক বৃদ্ধের পেটের ভিতর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। রোগী সমস্ত দিন কলে-পড়া মূর্ছিত ইঁদুরের মত কঠিন ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। এখন হঠাৎ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখি সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুইয়া আছে, ঘোলাটে অর্থহীন দৃষ্টিতে প্রাণ আছে কিনা সহজে স্থির করা যায় না, অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে গভীর নিশ্বাসের সহিত বক্ষসংলগ্ন বস্ত্রের মৃদু কম্পন বুঝিতে পারা যায়। একজন নবীন লেখক মোটর বাসের দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লাগিয়া বিকালে হাসপাতালে আসিয়াছিলেন, এখনও পর্যন্ত

সম্পূর্ণ অচৈতন্য। আজ মনে পড়িয়াছে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি, হয়ত আজ মরিয়া তিনি নিজের লেখাকেই নিজে অপ্রমাণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার সমস্ত মস্তিষ্কের গৌরব একখণ্ড জড়-পদার্থের সংঘর্ষে চিরদিনের মত লুপ্ত হইতে চলিল।

চন্দ্রশেখর শ্মশানকে সাম্যস্থাপক বলিয়াছেন, তিনি বোধহয় হাস-পাতালের ভিতর কখনও প্রবেশ করেন নাই। এখানে শ্মশান অপেক্ষাও অধিকতর সাম্য সর্বদাই বিরাজ করিতেছে। একই প্রকোষ্ঠ, সকলের যেন একই শয্যা, একই বস্ত্রাবলী। শরীরের সৌন্দর্য কখনও কাহারও ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আজ নাই। অগৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ উভয়ই অস্পষ্ট আলোয় প্রতিফলিত হইয়া রোগমসীমাখা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত চক্ষুই কোটরপ্রবিষ্ট. সকল মুখই কঠিন ও শুষ্ক, সব দৃষ্টিতেই সংশয় ও ভীতি. সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি জড়তাপূর্ণ, সব কণ্ঠেই নীরবতা, অথবা নীরবতা অপেক্ষাও ভীষণ অস্পষ্ট আর্তনাদ। নার্সটি তন্দ্রা-নিমীলিত চক্ষে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। রোগীদের মধ্যে যেন সেও আর এক রোগী। ব্যাধির দুষ্ট গন্ধে কলুষিত, অর্ধমৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে আপনার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। আমার চক্ষে ঘুম নাই, চঞ্চল মন সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু নানাবিধ চিন্তার ভিতর দিয়া হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে!' ('অলকা', বৈশাখ, ১৩৪৭)।

ডাক্তার সেন নতুন এসেছেন। আগে এমন অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। গভীর রাত্রে ঘরের কোণ থেকে ভেসে-আসা বিড়ালের 'মিঁউ' শব্দটিতেও তিনি যেন চমকে ওঠেন। নার্সকে ধমকের সুরে বলেন, বিড়ালকে ঢুকতে দেন কেন রাতে? নতুন ডাক্তারের কথা শুনে অভিজ্ঞ নার্সরা মুখ টিপে কেবল হাসেন। ভাবখানা ঃ বিড়ালকেও কি টাইম বেঁধে অসময়ে ঢোকা বন্ধ করা যায়?

নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেঙে নিচ থেকে একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। গরমও প্রচণ্ড। ফুল স্পীডের পাখাও যেন মার্চ মাসের গুমোট রাতকে বাগে আনতে পারছে না। দেয়ালে টাঙানো এক ক্যালেন্ডারের পাতা ফুরফুর করে উড়ছে। আজ ১৮ মার্চ। রাত বারোটা।

হঠাৎ ডাক্তারের চোখ দুটো আটকে গেল সামনের কেবিনের সেই

ছোট্ট ছেলেটির বেডে। একি! কে ওখানে? দুটি নার্সই তো বেডের দুদিকে দুটি চেয়ারে বসে আছে স্থির হয়ে! কিন্তু ছেলেটির বেডের মশারি তুলে তার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে কে ওখানে? উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে। হ্যাঁ, ঠিকই তো! কোনো মহিলা মনে হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছে। কে ও! অন্য কোনো নার্স? না। শাড়ি-পরার ধরন দেখে তো নার্স বলে মনে হচ্ছে না!

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে নার্সকে ডাকলেন ডাক্তার, দেখুন তো ঐ মহিলাটি কে? এত রাত্রে কি করছে ওখানে!

নার্সও দ্রুত বেরিয়ে এলেন তাঁর সীট ছেড়ে। ডাক্তার ও নার্স দুজনেই কেবিনের দিকে পা বাড়াতেই দেখেন ছেলেটির মা দ্রুতপায়ে তাঁদের সামনে দিয়েই সিঁড়ির দিকে নেমে গেলেন। গায়ে তাঁর গোলাপী রঙের ব্লাউস, পরনে নীল রঙের শাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লেন ডাক্তার: এরা ভেবেছে কি? রাত বারোটায়ও দারোয়ান ভদ্রমহিলাকে ঢুকতে দিয়েছে।

প্রথমেই তিনি নার্সের সঙ্গে গেলেন ছেলেটির কেবিনে। পাশে-বসা শুশ্রূষাকারী নার্স দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির মা যে এত রাতে আপনাদের সামনে কেবিনে ঢুকে পড়ে ছেলেকে দেখতে এসেছেন, আপনারা তো এর প্রতিবাদ করলেন না?

একজন নার্স নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, স্যর, উনি তো যখন-তখন কেবিনে আসেন, তাই ওঁকে বারণ করিনি! আমরা ভেবেছি আপনার পারমিশন নিয়েই উনি এসেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দারোয়ানকে ডাকলেন: তুমি এত রাত্রে আবার ঐ ছেলেটির মাকে ওয়ার্ডে ঢুকতে দিয়েছ?

দারোয়ান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে।

কী? কথা বলছো না কেন?—কত টাকা নিয়েছ ওঁর কাছ থেকে?—ধমকে উঠলেন ডাক্তার।

আমি? টাকা?—না সাহেব, আমি কাউকে ঢুকতে দিইনি। টাকাও কেউ দেয়নি আমাকে।

তবে এখনই কে বেরিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে? —কঠিন কণ্ঠস্বর ডাক্তারের।

কেউ না সাহেব, কেউ তো বেরিয়ে যায়নি! —আমি তো গেটেই বসে। তছাড়া গেটে রাত্রে তালা দেওয়া থাকে। কেউ আসেনি, যায়নি।

তোমার মিথ্যে কথা বলার মজা দেখাচ্ছি আমি!—বলে সোজা গোটা-চারেক-ঘরের-পরেই সিধে সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ডাক্তার।

ডাক্তারকে হন্তদন্ত হয়ে এ-ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে সুপারিনটেনডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার ডক্টর সেন? কি হয়েছে?

কি হয়নি বলুন তো! হাসপাতালের নিয়ম-শৃংখলা রাখা যাবে না ঐ দারোয়ানটির জন্যে। রাত বারোটায়ও ভিজিটর আসে রোগী দেখতে!

সে কি!—বিস্মিত সুপারিনটেনডেন্ট।—এত রাত্রে ভিজিটর! কে সে? কোন্ রোগীর কাছে এসেছে?

সেই ভদ্রমহিলা। ঐ কেবিনের ছেলেটির মা।—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দেন ডাক্তার।

ডিপথিরিয়া ছেলেটির! —বিস্ময়ের রেখা সুপারিনটেনডেন্টের কপালে।

হ্যাঁ।

আপনি ভুল দেখেছেন ডাক্তার সেন।—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

অসম্ভব। ভুল আমি কিছুতেই দেখতে পারি না। তাছাড়া নার্স তিনজনও কি ভুল দেখবে?

আপনার কি তন্দ্রা এসেছিল?

কি বলছেন আপনি? —কঠোরতর কণ্ঠস্বর ডাক্তারের। —আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখেছি, এই আপনার ধারণা হলো?

ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখলেন সুপারিনটেনডেন্ট। বললেন, শান্ত হোন। আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

আসুন না !

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে চলেছেন ডাক্তার।--কোথায় আমাকে নিয়ে যাবেন সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ?

ধীরে ধীরে ওঁরা গিয়ে ঢুকলেন মর্গে। যে-ঘরে মৃত ব্যক্তির লাশ রেখে দেওয়া হয়।

সামনে নিচের দিকে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলেন ডাক্তার। ঘরের মেঝেতে শোয়ানো সেই ছেলেটির মায়ের শবদেহ। গোলাপী রঙের ব্লাউস গায়ে, পরনে নীল শাড়ি। এও কি বিশ্বাস্য ?

একি ! কী করে হলো ?—ডাক্তারের চোখ ছানাবড়া।—আমরা যে নিজের চোখেই ওঁকে দেখেছি। তখন রাত ঠিক বারোটা।

আমি আপনাকে অবিশ্বাস করছি না ডাক্তার, তবে—বলতে বলতে লাশ-রাখা ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন দু'জন। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে আজও অনেক কিছু ঘটে যার কোনো ব্যাখ্যা নেই, যুক্তিবাদী মন নিয়েও যার মীমাংসা করা যায় না। আপনার বেলায়ও তাই ঘটেছে !

বিস্ময়ে অভিভূত ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এটা ঘটলো কি করে ? উনি তো আজ বিকেলেও ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন।

এসেছিলেন। আজই রাত দশটায় উনি খোলা ছাদ থেকে অন্ধকারে নিচে নামতে গিয়ে পড়ে যান রাস্তায়। মাথায় প্রচণ্ড চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গে এখানে নিয়ে আসেন ওঁর স্বামী। প্রায় দু'ঘণ্টা যমে-ডাক্তারে লড়ালড়ি চলে। কিন্তু লড়াইয়ে হার মানলো ডাক্তারেরা। ঠিক এগারোটা পঞ্চান্নতে উনি মারা যান।

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ডাক্তারের। কথা বলতে বলতে ওঁরা রুগ্ণ ছেলেটির কেবিনে ফিরে আসেন। ছেলেটির মা বেডের মশারি তুলে কিভাবে দাঁড়িয়েছিলেন দেখাতে যান ডাক্তার। মশারিটা উঁচু করে ছেলেটির মুখের দিকে লক্ষ্য পড়তেই আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠেন ডাক্তার : নেই—ছেলেটিও মারা গেছে ! দুই হাতে চোখ ঢেকে মশারির ভেতর থেকে মুখটা বার করে আনেন ডাক্তার।

সবাই দেখলেন, ছেলেটির ঠোঁটের কোণে এক ফোঁটা টাটকা রক্ত।

নিষ্প্রভ ঘোলাটে চোখদুটিতে যেন বিষাদের ছায়া। নিস্পন্দ-নিথর দেহ।

সবাই হাহাকার করে উঠলেন।

'অনেক চিন্তা করিয়াছি কিন্তু ঘটনাটি এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যাবেলায় রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, মৃত্যুর কোনো আশঙ্কাচিহ্নই তাহার শরীরে ছিল না। তাহা হইলে কি আসন্ন বিচ্ছেদ-বিধুরা অশরীরী মাতা চিরবিদায় লইবার সময় বলপূর্বক নিজ পুত্রকে ইহলোক হইতে লইয়া গেল?"

এর কী ব্যাখ্যা দেবেন বিজ্ঞানমনস্ক ডাক্তার?

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় কাশীতে বসে ঠাকুর-পূজা করেছিলেন মৃত আত্মাকে পাশে নিয়ে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) নিজের প্রত্যক্ষ-করা প্রেতাত্মা নয়, তাঁর পিতা মতিলালের দেখা যে-রোমহর্ষক ঘটনাটি তিনি পিতার মুখ থেকে শুনেছিলেন তা একদিন সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র শুনিয়েছিলেন। সৌরীনবাবু একদিন শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা শরৎদা, তুমি ভূত মানো ?

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, ওরে বাবা খুব মানি। ভূত দেখেছিও। তাছাড়া আমার বাবার মুখে একটি কাহিনী যা শুনেছি, তা ভুলবার নয়। কাহিনীটি বলছি শোনো ঃ

' বাবা কাশীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। পুজার্চনায় তাঁর বেশ মন ছিল। নিত্য অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়া এবং অন্য মঠ-মন্দিরে ঘোরা বাদ দিতেন না।

একদিন তিনি মন্দিরে শুনলেন এক ভদ্রলোকের দুঃখের কাহিনী।

ভদ্রলোক বললেন, তাঁর বাড়িতে তিনি নিত্য পূজা করেন। শালগ্রাম-শিলা পূজা। তিনি নিজে পূজা করেন, রাত্রে ঠাকুরের আরতি করেন এবং রাত্রে আরতির পর ঠাকুরঘরটি বেশ গুছিয়ে রেখে আসেন। ঠাকুরঘরে তালা লাগানো থাকে রাত্রে। কেন না, বিগ্রহের গায়ে সোনার গহনা আছে, পাছে চুরি যায়।

ভদ্রলোক বললেন, রাত এগারোটা-বারোটা নাগাদ তালাবন্ধ ঠাকুর-ঘরে তিনি আরতির ঘণ্টা শোনেন। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখেন, কোথাও কেউ নেই, অথচ ঠাকুরের সামনে আসন পাতা। আসনের কাছে থালায় ফুল, তুলসিপাতা প্রভৃতি উপকরণ। সেগুলো বেশ সাজানো-গোছানা নয়—পাত্র থেকে ফুল প্রভৃতি নিয়ে পূজা করা হয়েছে যেন—কোষাকুষিতে জল পর্যন্ত।

অথচ ভদ্রলোক নিজে আরতি শেষ করে কোষাকুষি, পুষ্পপাত্র সব কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে যথাস্থানে রেখে, বেরিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করেছেন। তার উপর শালগ্রাম-শিলাকে ঠাকুরের বিছানায় শুইয়ে ভদ্রলোক ঠাকুরের খাটে মশারি পর্যন্ত ফেলে এসেছিলেন—ঠাকুর ঘুমোবেন। কিন্তু তালাখুলে অত রাত্রে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখেন, ঠাকুরের খাটের ছোট মশারি তোলা। ঠাকুরকে বিছানা থেকে নামিয়ে আসনের সামনে তামার টাটে রাখা এবং শালগ্রাম-শিলার গায়ে চন্দন মাখানো, ফুল-তুলসিপাতা দেওয়া। তিনি আরতির পর ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর এ-চন্দন, এ-ফুল কোথা থেকে কে নিয়ে এলো? আশ্চর্য কথা! শুধু এক রাত্রি নয়, প্রতি রাতে এ-ব্যাপারটি ঘটতে লাগলো।

এ-কাহিনী শুনে বাবার কৌতূহল হলো। তিনি বললেন, আমাকে সুযোগ দেবেন, এ-রহস্যের যদি মীমাংসা করতে পারি।

ভদ্রলোক বললেন, ভূতের কাণ্ড মশাই। তবে মজা এই, বাড়িতে আজ পর্যন্ত কেউ ভয় পায়নি। এ-ভূত ভয় দেখায় না, শুধু ঠাকুরঘরে ঐ আরতি-পূজা করা তার কাজ। টাইম একেবারে বাঁধা—রাত বারোটা নাগাদ এ-ব্যাপার ঘটে। তার আগেও নয়, পরেও নয়।

যাই হোক, সে-ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন এবং বাবাকে সেই রাত্রেই তাঁর বাড়িতে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

বাবা সেদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করলেন না। গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধাচারে ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পূজারতি দেখলেন এবং পূজারতির পর যথারীতি যখন ঠাকুরঘরে তালা বন্ধ হবে, তিনি তখন গৃহস্বামীকে বললেন, রাত্রে তালাবন্ধ করবেন না, আমি ঠাকুরঘরে থাকবো রাত বারোটা পর্যন্ত। তবে আমি একলা থাকবো, আপনারা কেউ ঠাকুরঘরে থাকবেন না।

ভদ্রলোক রাজি হলেন এবং বাবা ঠাকুরঘরে রইলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো।

তারপর দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো এবং বারোটা বাজে, তখন বাবা দেখলেন—গরদের থান পরা, গায়ে নামাবলী জড়ানো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘরে! কোথা দিয়ে এলেন, তা নজরে পড়েনি। তিনি ব্রাহ্মণের পানে ঠায় চেয়ে আছেন।

ব্রাহ্মণ আসন পাতলেন, কোষাকুষি নিয়ে তাতে ঘড়া থেকে গঙ্গাজল ঢাললেন। তামার টাট নামিয়ে আসনের সামনে রাখলেন, শালগ্রাম শয্যা থেকে বার করে সেই তামার টাটে রাখলেন।

বাবা খুব কাছেই বসে আছেন, অথচ তাঁর দিকে ব্রাহ্মণের দৃক্‌পাত নেই। বাবা নিঃশব্দে দেখছেন। ব্রাহ্মণ পূজায় বসলেন—কোষার জল নিয়ে আচমন , আসনশুদ্ধি, তারপর পূজা। সচন্দন ফুল পড়তে লাগলো শালগ্রামের গায়ে—যথারীতি পূজা।

বাবা কাঠ হয়ে বসে সে-পূজা দেখছেন। তারপর আরতি। ঘণ্টা বাজিয়ে, পঞ্চপ্রদীপ জেবলে যথারীতি আরতি। তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ অদৃশ্য হলেন।

বাবা ঠাকুরঘরের দরজা খুললেন। ঘরের বাইরে ভদ্রলোক এবং তাঁর বাড়ির ক'জন পরিজন। বাবা তাঁদের সমস্ত ব্যাপারটা বললেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চেহারার যে-বর্ণনা দিলেন, শুনে ভদ্রলোকের গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন, এ-চেহারা আমার স্বর্গগত বাবার। তিনি নিজে পূজাদি করতেন।

বাবা বললেন, কাল রাত্রেও আমি এ-ঘরে থাকবো এবং চেস্টা করে দেখবো যদি কোনো কথা জানতে পারি।

পরের দিন রাত্রে বাবা সে-ভদ্রলোককে পূজারতি করতে দিলেন না।

বললেন, আমিই আজ পূজা করবো এবং রাত পৌনে বারোটায় পূজায় বসবো।

কথামতো কাজ। ঠাকুরঘরে বাবা পূজায় বসেছেন। তিনি আরতি করতে যাবেন, হঠাৎ পাশে দেখেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!

বাবা বললেন, আমায় অনুমতি দিন, আমি আরতি করি!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, করো, আমি দেখবো।

বাবা আরতি করলেন। আরতির পর বৃদ্ধকে বাবা বললেন, আপনি কেন এত কষ্ট করে ইহলোকে আসেন?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, ছেলে পূজারতি করে, কিন্তু শুদ্ধাচারে করে না। তার চায়ের নেশা, সন্ধ্যায় চা খেয়ে তারপর আরতি করে।

—আমি তাঁকে মানা করে দেব।

—হ্যাঁ, তাকে বুঝিয়ে বলবে, ঠাকুরদেবতার পূজায় ফাঁকি চলে না। পূজা যদি করতে হয় তো আচার রক্ষা করে পূজা করা চাই, নাহলে শুধু ফুলফেলা আর ঘণ্টা নাড়ানোতেই ঠাকুরের পূজা হয় না। বহুকাল থেকে আমি ওর এই অনাচার লক্ষ্য করছি। পূজারতি অনেক কাল থেকেই আমি রাত্রে এসে করি। সকালে যারা ঠাকুরঘর ধুয়েমুছে সাফ করতে আসে, তাদের খেয়াল থাকে না, ঘরে এত ফুল পড়ে আছে কেন? তাই ওদের যাতে টনক নড়ে সেজন্য ঘণ্টা বাজানো শুরু করেছি আরতির সময়। আগে আমার ঘণ্টা নাড়ায় শব্দ করতাম না। এখন করি শুধু এদিকে ওদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে।

এমনি উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ আরও বলেছিলেন, পূজায় যদি মন বা বিশ্বাস না থাকে, তাকে বোলো, ভড়ং করবার প্রয়োজন নেই। ·

বাবা তারপর প্রশ্ন করেন, আপনার আর কিছু বলবার আছে আপনার ছেলেকে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, গয়ায় গিয়ে মরা-বাপের পিণ্ডটা দিয়ে আসতে বোলো। এ তো শক্ত কাজ নয়।

এ-সব কথা বাবা ভদ্রলোককে বললেন। এর পর থেকে তিনি আচার-নিষ্ঠ হয়েই পূজা-অর্চনা করতেন। এবং মৃত পিতার আত্মার শান্তির জন্যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডও দিয়ে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও অতি-প্রাকৃত তথ্যানুসন্ধানের জন্য

প্লানচেটে বসতেন

'পৃথিবীতে কতকিছু তুমি জানো না, তাই বলে সেসব নেই ? কতটুকু জানো ? জানাটা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এত লোক দলবেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলবে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বই কি! কিন্তু যে-বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে-সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে-কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়াটাই গোঁড়ামি।'—কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে।

কথা উঠেছিল মংপুতে বসে। প্লানচেট, মিডিয়ম, আত্মা—এসব নিয়ে। যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ সেদিন সবকিছু ভাঁওতা বলে এ-ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারেননি। তাঁর কাছে মৃত্যু তো এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া। ইহলোকের প্রভাত থেকে পরলোকের রাত্রিতে প্রবেশ করা।

তাঁর কাছে দুটোই সত্যি। মায়ের এক স্তন থেকে অন্য স্তনে শিশুর মুখ রাখা। 'স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে, ' মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।'

অতএব মৃত্যু কি? এত ভয়, এত সংশয় এই মৃত্যুকে নিয়ে? জন্ম ও মৃত্যুর দুটো ঘরের মধ্যে দরজা তো মাত্র একটি! 'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

সবই ঠিক। কিন্তু মানুষ বোঝে কই? কী ভয়ানক শব্দ এই 'মৃত্যু'। শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছে সমস্ত আনন্দ-কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে যায় কেন? রিপুরা কেঁদে ওঠে ভয়ে, মন থেকে আর্তনাদ করতে করতে পালায় কুটিল কামনা। এ-সবের কারণ বোধ-করি, 'জীবন আমার / এত ভালবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়, / মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়॥'

মৃত্যুকে ভালোবাসতে পারলেই, মৃত্যুভয় দূর হবে মানুষের মন থেকে। এই বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে বসেছেন। পরলোক থেকে বিদেহী আত্মাদের ডেকে আনিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, তাঁর আগেও ঠাকুরবাড়িতে বিদেহী আত্মার সঙ্গে অনেকেই কথা বলেছেন প্লানচেটের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের চক্রে কিন্তু প্রায়শই মিডিয়ম হতেন উমা সেন। ডাক-নাম 'বুলা'। বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা।

বুলাকে মিডিয়ম করে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরলোকের আত্মাকে আনিয়েছেন। কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে। তাঁর ডাকে এসেছেন মাইকেল মধুসূদন, জ্যোতিদাদা, কন্যা মাধুরীলতা, স্ত্রী মৃণালিনী, নতুন বৌঠান কাদম্বরী, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, পুত্র শমীন্দ্রনাথ। এসেছেন কবি-অনুরাগী অজিত চক্রবর্তী, সতীশ রায়, মণিলাল গাঙ্গুলি, সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায় প্রমুখ।

'মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেকথা আমি বিশ্বাস করিনে।' হ্যাঁ। বিশ্বাস করেন না বলেই তো তিনি মৃত স্ত্রী মৃণালিনীর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মতামত জেনে নিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। কেন, সেবার পুত্র রথীর বিয়ের ব্যাপারে? অবনীন্দ্রনাথের বিধবা ভাগ্নী প্রতিমার

সঙ্গে তাঁর পুত্র রথীর বিয়ে দেবেন কিনা জানতে চাইলেন মৃণালিনীর বিদেহী আত্মার কাছে।

সম্মতি পেয়েছিলেন তিনি।...'যখনই আমি কোনো একটা সমস্যায় পড়ি, যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর (স্ত্রীর) সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।'

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা' নামে বই লিখেছেন। প্রভূত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাপারগুলো শান্তিনিকেতন থেকে পুরনো কাগজপত্র ঘেটে তিনি উদ্ধার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের এক অদৃশ্য দিকের প্রতি আলোকপাত করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীকে প্লানচেটে আনার ব্যাপারটা উদ্ধার করছি ঃ

'সেই নতুন বৌঠান আত্মহত্যা করলেন ১৮৮৪ সালে, মাত্র ২৫ বছর বয়সে। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কোনদিন ভুলতে পারেন নি, জীবন-সায়াহ্নে এসেও বার বার স্মরণ করেছেন স্নেহময়ী মমতাময়ী নতুন বৌঠানকে। ...এই পরমাত্মীয়র মৃত্যুর পরেও বার বার ঘুরে ফিরে এসেছেন কবির জীবনে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে স্বপ্ন দেখেছেন অল্প কয়েকবার, দেখেন নতুন বৌঠানের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন, 'তুমি কেন এলে; এখানে তোমাকে আর কেউ চায় না।'

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন মিডিয়মে কাদম্বরী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ আনেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,—'বোকা ছেলে, এখনও তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।'

রবীন্দ্রনাথ সেই পুরাতন সম্বোধনে বৃদ্ধ বয়সেও খুশি হয়েছিলেন।

এই কাদম্বরী দেবী যখন মিডিয়মে আসতেন, কদাচিৎ নাম বলতেন, কিন্তু কথার ধরনে রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন তিনি কে? ১৯২৯ সালের ৪ নভেম্বর। কাদম্বরী দেবী এলেন।

কে?

—নাম জিজ্ঞাসা কোরো না। তুমি মনে যা ভেবেছ, আমি তাই।

তারপর মিডিয়মে কাদম্বরী যা বললেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য।

—'যে সব কথা বেরোলো সে ভারী আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ জানে না।' (রাণী মহলানবীশকে চিঠি)

আর একটি দিন। ১৯২৯ সালের ২৮ নভেম্বর। আবার নতুন বৌঠান।

কে?

—এখন তো সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু এখন তো আসবো না জানো।

না, এখন কাজ নেই।

সেই নভেম্বরেরই ঊনত্রিশে। বিকেল। শান্তিনিকেতন।

কে? কী নাম?

—আমি একটি কথা বলে চলে যাব। জানি কিছুকাল তোমার কাছে আসা সম্ভব হবে না।…

আমার কাছে আসার দরুণ কোন ক্ষতি হয়েছে তোমার এখন?

—না, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি কার ভিতর দিয়ে আসব

ঐখানে যে মিডিয়ম আছে, তাকে অবলম্বন করে তো আসতে পারো

—তিনি যদি না থাকেন?

তিনি থাকবেন না, তা তো জানি।

—সেই কথাই বলছি।

হ্যাঁ, অনেকদিন হয়তো পাবো না। আবার কলকাতায় যখন ডাকবো, তখন আসবে?

—বেশ, যাই।

খানিক বিরতি। আবার আত্মার আবির্ভাব। আবার রবীন্দ্রনাথ নড়ে-চড়ে বসেন।

—কে? কী নাম?

—যাইনি।

ভালো। তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা করেছি, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হয়নি ?

—না, ভাল লেগেছে।

কাল রাতে কি এসেছিলে ?

—বলবো না।

কাল রাতে কি কাছে এসেছিলে ?

—কথা বলব কী করে ?

হয়ত এসেছিলে আমার মনে হয়। মিডিয়ম না থাকলে আসতে পারো না ? এখানে আর কোন মিডিয়ম আছে বলতে পার ?

—না, কেমন করে বলব, ঠিক কে যে ডেকে নেয়, তা তো আগে থেকে বোঝা যায় না। তুমি মুশকিলে পড়েছ, আমি যাই।

এবারও নাম নেই। কিন্তু অনুমান করা যায় কাদম্বরী দেবী। তারপর আর একদিন। ১৯২৯ সালের ২৯ নভেম্বর। রাত।

কে ?

—কূলহারা সমুদ্রে আমার তরী ভাসিয়েছিলুম, আজও দাঁড়িয়ে আছি সেই চেনা ঘাটে।

তুমি নাম বলবে না ?

—না।

একটা কবিতা লিখে দেবে ?

—আমার বিদ্যে কি অজানা ?

আমি তোমার কথা শান্তিনিকেতনে অনেকবার ভেবেছিলুম। আমার শরীর ভাল ছিল না। তখন তোমায় ভেবেছি। তুমি জানতে ?

—জানি। আমি আসতে পারিনি। মনে মনে এসেছিলুম। কেমন করে বা বোঝাব।

আমি তোমাদের কিছু বুঝতে পারিনে। কী করে আস, কী করে যাও, কী করে থাক—কিছু বুঝতে পারিনে।

—শেষ রাত্রে শিরশিরে হাওয়ায় তুমি যখন গায়ের কাপড়টা টেনে নিলে, আমি এসেছিলুম তখন।

আমি তোমাকে মনে মনে বলেছিলুম একদিন যে, আমার অসুখ করেছে, তুমি যদি এসে থাক আমায় একটু সেবা করে যাও।

—তুমি চাও, কিন্তু ভাল করে দেবার মতো শক্তি তো আমার নেই। তাই বড় অভাব বোধ হয়। তোমাকে কী মুশকিলে ফেলেছি।

কিছু মুশকিলে ফেল নি। তোমার এখন যে রূপ আছে, সে কি আগের মতো—তোমায় আমরা যেমন দেখেছিলুম ?

—শমীর ভাষায় বলা যায়, কারো বা ঝড়ের হাওয়ার মত, কারো বা ফুরফুরে হাওয়া।

তোমরা পরস্পরকে দেখ যে, জানো যে, সেটা কেমন করে হয় ?

—হাওয়ার কি রূপ নেই ?

আমাদের কাছে তো হাওয়ার রূপ নেই।

—ভাব আছে, গতি আছে, বেগ আছে।

তোমাদের পরস্পরের সঙ্গে কি ঐরকম প্রভেদ—যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার প্রভেদ ?

—না না, অন্য রকম। বোঝানো যায় না। তুমি আমায় দেখলে ঠিক চিনবে। আমার ছায়াটা আজও আছে, প্রাণ আছে, দেহ নেই শুধু।

কোন নাম নেই, ইনিও সেই নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের (১৮৮২) দু'বছর পরে কাদম্বরী দেবী আত্মঘাতী হন (১৮৮৪)। রবীন্দ্রনাথের ডাকে তিনি বার-তিনেক এসেছেন প্লানচেটে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় ঃ 'বাল্যকালে ও যৌবনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্লানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে। বৃদ্ধবয়সে এতকাল পর এই পরিচিতা মিডিয়ামের (বুলা) সাহায্যে অতি-প্রাকৃত তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।'
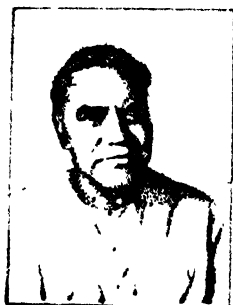
শনিবারের চিঠির সম্পাদক

সজনীকান্ত দাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর সদ্য-
প্রয়াত মেজদাকে তাঁর নিজের ঘরে

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৪৬)। নামটি শুনলেই 'শনিবারের চিঠি'র দুঁদে সম্পাদকের কথা মনে পড়ে যায়। তখনকার দিনে কোন্ সাহিত্যিক, কোন্ দেশসেবক জ্বলেননি এঁর কলমের খোঁচায়? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ যাননি 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে। একসময় 'কল্লোলগোষ্ঠী'র অনেক লেখকই সজনীকান্তের শত্রুর পর্যায়ে পড়ে গিয়েছিলেন। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র (প্রথম প্রকাশ: 'মোসলেম ভারত', ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা) প্যারোডি 'আমি ব্যাঙ / লম্বা আমার ঠ্যাং / ভৈরব রভসে বরষা আসিলে ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাং।' ইত্যাদি লিখে নজরুলকে চটিয়েছিলেন। এ-সব পৃথক্ ইতিহাস। তিনি যেমন দোর্দণ্ডপ্রতাপে 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা করেছেন তেমনি 'বঙ্গশ্রী', 'দৈনিক বসুমতী', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' সম্পাদনায়ও বিশেষ নৈপুণ্যের সাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত

'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'অজয়', 'ভাব ও ছন্দ', 'কেড্‌স ও স্যান্ডাল' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম সংযোজন। তাঁর রচিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' বাঙালী গবেষকদের পক্ষে আজও বিশেষ সহায়ক আকর গ্রন্থরূপে বিবেচিত।

এ-হেন সজনীকান্ত কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ছাত্র নন। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি. এস-সি. পাশ করে এম. এস-সি. পড়তে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র। যুক্তিবাদী মন নিয়ে সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তাঁর নিজের কথায়ঃ 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। আচারে-ব্যবহারে, ভ্রমণে-পর্যটনে, খাদ্যে-পানীয়ে কালাপাহাড় বলিয়া পরিচিত মহলে আমার অখ্যাতি আছে; তবু আজ অস্বীকার করিতে পারি না, অলৌকিক শ্রেণীর দুইটি ঘটনার আমি সাক্ষী হইয়া আছি। দুইটি ঘটনাই আমার মনের উপর এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, আমার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।'

কী সেই অলৌকিক ঘটনা?

ঘটনা দুটিই ১৯১২ সালের ঘটনা। সজনীকান্তের পিতা হরেন্দ্রলাল দাস তখন সপরিবারে মালদহ-ইংরেজবাজারের কাছেই কালীতলা পল্লীতে থাকেন। সজনীকান্তের মা তুঙ্গলতাও আছেন। হরেন্দ্রলাল সিউড়ি গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে বর্ধমান রাজ কলেজে এফ. এ. (ফাস্ট' আর্টস্) পড়তে পড়তে সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করেন। ১৯২৬-এ দিনাজপুর থেকে পার্টিশন-ডেপুটি কালেকটর-রূপে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১২-তে তিনি পাবনায় সাব-ডেপুটি কালেক্‌টর হয়ে সেখানে আসেন। মালদহে এসেছেন বাড়িতে। সজনীকান্তের মেজদা এই সময়ে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। বড় বড ডাক্তার এলেন, এলেন বদ্যি-কোবরেজ। কিছুতেই অসুখ সারলো না। বাড়ির সকলেই পালা করে দিন-রাত মেজদার সেবা-শুশ্রূষা করেন।

সেদিন বাবা হরেন্দ্রলাল পুত্র সজনীকান্তকে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়ে বাড়ির ছাদে চলে গেলেন। রাত প্রায় শেষের দিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন সজনীকান্ত পাখার বাতাস করছেন তাঁর অসুস্থ মেজদাকে আর ছাদে বাবার ভারি পায়ের শব্দ শুনছেন। অসুস্থ মেজদাও তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'হঠাৎ

বাবার পায়ের শব্দ থামিয়া গেল। প্রতিবেশী বন্ধু যতীনকাকা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া মেজদার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। বাবার দৃঢ়কণ্ঠ কানে আসিল, আজই শেষ হয়ে যাবে। আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। ঘুমজড়ানো চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গেল! সে কি?—সে কি? —বলিতে বলিতে যতীনকাকা বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন! বাবাও ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। আমি আড়ালে থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিলাম।'

মেজদা বাঁচবে না? আজকেই সব শেষ হয়ে যাবে?—কান্নায় ভেঙে পড়লেন সজনীকান্ত! কিন্তু বাবা এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কিভাবে? কি দেখেছেন তিনি? না কি, তাঁর অমূলক ধারণা?

না। অমূলক কল্পনার আশ্রয়ে লালিত হয়নি হরেন্দ্রনাথের এ-চিন্তা। তিনি সেই রাতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই অবিশ্বাস্য ঘটনা।

স্ত্রী তুঙ্গলতা তাঁর পালা সাঙ্গ করে অসুস্থ পুত্রের শিয়র থেকে উঠে চলে গেছেন পাশের ঘরে। তাঁর এখন বিশ্রাম নেবার পালা। এর পর পুত্রের শিয়রে বসেছেন হরেন্দ্রলাল। অর্থাৎ ঘটনাটি সজনীকান্তের আসার ঠিক আগের মুহূর্তের।

হরেন্দ্রলাল একা মুমূর্ষু পুত্রের শিয়রে বসে। রাতের শেষ প্রহর।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক লাল আলো এসে সমস্ত ঘর ভরে গেল। চমকে উঠলেন হরেন্দ্রলাল। বিস্ময়ে হতবাক্। একি! কোথাও আগুন লাগলো নাকি? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ঘরের চারিদিকে চাইলেন। কারণ অনুসন্ধান করতে চাইলেন। না, কোথাও কিছু নেই। কিন্তু এত তীব্র লাল আলো এলো কোথা থেকে? সেই আলোর মধ্যে তিনি হঠাৎ দেখলেন, তাঁর মুমূর্ষু পুত্র বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে। কাকে যেন উদ্দেশ করে বলছে, এই যে আমি যাচ্ছি।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন পিতা হরেন্দ্রলাল। সঙ্গে সঙ্গে শয্যাশায়ী মুমূর্ষু পুত্র আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। আর লাল তীব্র আলো ধীরে ধীরে ঘর থেকে মিলিয়ে গেল।

হরেন্দ্রলাল আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপর কাউকে কিছু না বলে সজনীকান্তকে রোগীর শিয়রে বসিয়ে ছাদে গেছেন হরেন্দ্রলাল।

প্রতিবেশী বন্ধু যতীনবাবুকে,এই প্রথম এ-ঘটনার কথা জানালেন

তিনি। তিনি আরও বললেন, আমার দাদার মৃত্যুশয্যায় বসে ঠিক এইরকম দৃশ্যই দেখেছিলাম। সেদিন দাদা তাঁর মৃতা পত্নীকে উদ্দেশ করে এই কথা কটি বলেছিলেন, কিন্তু আজ অজুর কাছে কে এসেছিল তাকে নিতে? —জলভরা চোখে হরেন্দ্রলালের এ-প্রশ্ন ছিল সেদিন যতীনবাবুর কাছে নয়, ছিল তাঁর নিজের কাছে।

সজনীকান্তের কথায়ঃ 'মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত না হইতেই সত্যই সব শেষ হইল। আমাদের ক্ষুদ্র সুখী সংসারে সেই প্রথম মৃত্যু প্রবেশ করিল। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দিদি নিতান্ত শিশু অবস্থায় বিদায় লইয়াছিলেন, সে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করে নাই। মেজদার মৃত্যুতে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বাবা খুবই বিচলিত হইলেন। মা কিন্তু ধীর স্থির ছিলেন।

মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের ঠিক পূর্বে বাবা ও ভাইবোন সকলে আমরা মায়ের শয়নঘর অর্থাৎ বড়ঘরের মেঝেতে চৌকিতে বসিয়া মেজদার প্রসঙ্গ আলাপ করিতেছিলাম। মা দুধ গরম করিতে সামনেই রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিলেন। হঠাৎ বাবা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেজদার নাম ধরিয়া ডাকিতেই আমরা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দেখিলাম, মেঝের ঠিক মাঝখানে রক্ষিত একটা খালি চেয়ারে একটা লাল আলোয়ান গায়ে জীর্ণশীর্ণ মেজদাদা আসিয়া বসিয়াছেন। বাবা চিৎকার করিয়া মাকে ডাকিলেন, ওগো, কে এসেছে দেখে যাও।

মা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরিয়া প্রায় ছুটিতে ছুটিতে শোওয়ার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়া মেজদাকে দেখিয়াই 'বাবা আমার' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুধের বাটি ছিটকাইয়া ঝন্ঝন্ শব্দ করিতে করিতে মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। আমার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই ফিরিয়া দেখি, মেজদা অন্তর্ধান হইয়াছেন। মায়ের মূর্ছার সেই সূত্রপাত। তাহার পর ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল। মা কোথাও স্তব্ধ হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিতাম, বিপদ আসিতেছে—

মৃত মেজদাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছিলাম। বাবা মেজদার নাম ধরিয়া ডাকাতেই আমরা হিপ্নোটাইজড হইয়াছিলাম, ঘটনাটি কখনই সেইভাবে উড়াইয়া দিতে পারি নাই।

পরে এই বিষয়ে বহু বই পড়িয়াছি, বড় বড় নামকরা পথভ্রষ্ট (?)

বৈজ্ঞানিকদের আলোচনাও দেখিয়াছি এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে অনেক তত্ত্ব জানিয়াছি। বিভূতিকে বাহিরে কখনই আমল দিই নাই, ঠাট্টা করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিয়াছি ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মত মৃত্যুপরপারের এই টুকরা রহস্যটি আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করিয়াছে। সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গেই মানুষের আরম্ভ নয়, এবং চিতায় দগ্ধ হইয়াও যে তাহার শেষ নয় — এই বিশ্বাস আমার দৃঢ়মূল।' ['আত্মস্মৃতি ১ম খণ্ড]

সজনীকান্তের এই স্বীকারোক্তির অপূর্ব রসাস্বাদ তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যেও পাওয়া যায়। তিনি 'মেজদিদি' চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখে দিয়েছিলেন,

'জনম-মরণ পা-ফেলা আর পা-তোলা তোর ওরে পথিক,
স্মরণ যদি রাখিস তবে পদে পদে ভুলবি না দিক্।
নয়কো শুরু আঁতুড় ঘরে
শেষ নয়কো চিতার 'পরে
আগেও আছে পরেও আছে এই কথাটা বুঝে নে ঠিক।'

তাঁর 'রাজহংস'-এর উৎসর্গ-পত্রে মাকে সম্বোধন করে যে কবিতা লিখেছিলেন, তাতেও 'ওপার হইতে এপারে আমাকে তুমি এনেছিলে মাতা'-র উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি জোর দিয়ে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন : 'যাঁহারা এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন —আমার মেজদাদা, মা, বাবা, বড়দাদা—তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্তমান আছেন, আমি যেমন গতজন্মে বর্তমান ছিলাম এবং পরজন্মে থাকিব।'

সজনীকান্ত এ-বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশোনাও করেছেন। অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel), জে বি রাইন, কেনেথ ওয়াকার, জে ডবলিউ. এন. সালিভান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণও এই পারলৌকিক তত্ত্ব এবং এই অজ্ঞাত অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞানী ক্যারেল তো বলেই দিয়েছেন তাঁর 'Man : the unknown' গ্রন্থে, মানুষ মৃত্যুর কিছু আগে বা কিছু পরে স্বশরীরে তার প্রিয়জনের কাছে আসতে পারে। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তাও তারা বলতে পারে।

কেন, আমাদের ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ঋষি বামদেব তাঁর সম্বন্ধে তো বলেছেন ভৌতিক ইহজীবন হলো গর্ভবাস। 'এই বিচিত্র ব্যাপার

কি করে সম্ভব হইল আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সজনীকান্তের জীবনের দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল তাঁরই প্রিয়তম বন্ধু কিরণচন্দ্র দত্তকে নিয়ে। সজনীকান্ত থাকেন তখন কিরণচন্দ্রের সঙ্গে বাঁকুড়া হোস্টেলে। আই. এ এবং আই. এস-সি.-র টেস্ট পরীক্ষা সামনে। দু'জনেই রাতদিন বই মুখে বসে থাকেন। রেজাল্ট ভালো করতেই হবে। এরপর সজনীকান্তের নিজের কথায় শোনা যাক: '···কিরণ একটু বেশি রকম। সে প্রায় দিবারাত্র বই-মুখে বসে থাকে। উচ্চৈস্বরে লজিক অথবা ইংরাজী পাঠ্য মেকলের হিস্ট্রি অব্ ইংলণ্ড প্রথম ভাগ আওড়ায়। পাঠে অতি নিষ্ঠার জন্য সে আমাদের হিংসা ও পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিল। একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠিক পূর্বে এইভাবে পড়িতে পড়িতে সে হঠাৎ গোঁ-গোঁ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া গেল। এক নাগাড়ে সাত দিন মুহূর্তের জন্য তাহার জ্ঞান ফিরিল না। হোস্টেলের ডাক্তার, শহরের সেরা ডাক্তার সকলেই পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন, আমরা কয়েকজন কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিবারাত্র পালা করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলাম। পড়াশোনায় আমার একেবারেই মন ছিল না। আমার ভালই লাগিল এবং এই সেবাদলের নেতৃত্বভার আমিই গ্রহণ করিলাম। অসুখের গোড়ায় রোগীর কাছে বসিয়া আমরা শুধু 'ওয়াচ' বা পর্যবেক্ষণ করিতাম। সম্পূর্ণ অজ্ঞান রোগীকে লইয়া আর কিছু করিবার ছিল না।

দ্বিতীয় দিনে অজ্ঞান অবস্থাতেই কিরণের মুখে কথার খই ফুটিতে লাগিল। শুরু হইল মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া। বইটির প্রথম লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া একবারে শেষ লাইন পর্যন্ত সে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া গেল। বইটি আমারও পাঠ্য, সুতরাং কিরণের কেরামতি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। হলফ করিয়া বলিতে পারি, সজ্ঞানে কিরণ দশ লাইনও এক সঙ্গে মুখস্থ বলিতে পারিত না। ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সে কোথায় পাইল! বেশিক্ষণ ভাবিবার সুযোগ মিলিল না। কিরণ আমাদের চমকিত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত জীবন-নাট্যের হুবহু পুনরাভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ সুদূর

শৈশব হইতে আধুনিকতম বর্তমান পর্যন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছে সেগুলিতে তাহার নিজের ভূমিকা সে নিজেব যথাযথ পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল, ভাবভঙ্গি, কণ্ঠের উঁচুনীচু পরদা সমেত। অনেকগুলি ঘটনায় আমরাও জড়িত ছিলাম, মনে মনে মিলাইয়া দেখিলাম, এক চুল এদিক ও দক হইতেছে না।'

কিরণচন্দ্রের এরূপ জ্ঞানশূন্যতার মধ্যেও কথা বলা দেখে সজনীকান্ত ও তাঁর সহকারীরা খুবই ঘাবড়ে গেলেন। কথাবার্তা একাই বলে যাচ্ছেন কিরণচন্দ্র। এযেন টেলিফোনের এক দিকের কথাই শুনতে পাচ্ছেন সজনীকান্তরা। তবে কি কোনো প্রেতাত্মা ভর করলো কিরণচন্দ্রের শরীরে? কিরণের অভিভাবক তাঁর ভগ্নিপতি শিববাবু। তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানানো হলো কিরণের অবস্থা জানিয়ে।

বাঁকুড়ার সব নামকরা ডাক্তারও এলেন। কিরণের এই অবস্থা দেখে কেউ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। রোগটা কী? একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করেন। কোনো ডাক্তারই কিছু করতে পারছেন না।

হঠাৎ সজনীকান্তের কানে এলো, মেজর বিয়ানি নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ তুর্কী ডাক্তার বাঁকুড়ায় আছেন। তিনি তখন বাঁকুড়ার এক গৃহে সরকারের নজরবন্দী।

সবাই ছুটলেন মেজর বিয়ানির কাছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে হোস্টেলে আনা হলো তাঁকে। তিনি এসেই রোগীকে আকণ্ঠ গরম জলে চুবিয়ে রেখে মাথায় বরফ দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিরণের জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিরে পেতেই কিরণ যেন ঘুম থেকে উঠেছে এখনি—এমনি ভাব দেখালেন। তাঁর যেন কিছুই হয়নি প্রথমে তিনি কথা বললেন, আমার বই? বই কোথায়?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সজনীকান্ত ও তাঁর সঙ্গীরা।

তুর্কী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন সজনীকান্ত, এমন কি করে হলো কিরণের?

ডাক্তার বললেন, মানুষের মস্তিষ্ক-কোটরে সমস্ত জ্ঞানই সঞ্চিত থাকে এই কোটর-দ্বার সকলের পক্ষেই চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কারো পক্ষে যদি পুনরায় ঐ দ্বার খোলে, তখনই এরূপ ঘটে থাকে।

ডাক্তারের এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি সজনীকান্তের কাছে। 'জড়বাদী ডাক্তারের এই জবাবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই। ভারতীয় যোগ সম্পর্কে দেশী এবং বিলাতী অনেক বই পড়িয়া ঘটনাটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অতীতস্মর হইতে পারে, কিরণ তাহার প্রমাণ। মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করিলে শুধু অতীতস্মর নয়, জাতিস্মরও হইতে পারে। জন্মজন্মান্তরে সে কি ছিল, কি করিয়াছে সে তাহা হুবহু স্মরণ করিতে পারে, অনেকে স্মরণ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের কোনো কোটরে নয়, কারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সে কোটরও ধ্বংস হয়, আত্মার সঙ্গেই এই জন্মান্তর স্মৃতি জড়িত থাকে। যোগবলে বলীয়ান মানুষ অথবা ভাগ্যবান্ অবতারকল্প পুরুষ সেই স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিতে পারেন। কিরণের ঘটনায় এই 'অলৌকিকে'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি, ইহা জড় বিজ্ঞান বা ডাক্তারী শাস্ত্রের আয়ত্তে নয়।'

'আত্মার সঙ্গেই এই জন্মান্তর-স্মৃতি জড়িত'—এই উপলব্ধ জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিক-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস সাহিত্য-সমালোচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, সঙ্গীতকারের মর্যাদাও সমপরিমাণে লাভ করেছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভিতরে ও বাইরে তাঁরই সহযোগী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণচাঞ্চল্য দ্রুত সঞ্চার করেছেন। পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী সজনীকান্ত তাই বলতে পারেন ঃ

মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।
মৃত-জীবিতের মাঝে হে বন্ধু, কিসের ব্যবধান,
মৃত্যুরে কে জানিয়াছে, কে পেয়েছে জীবন-সন্ধান ?
মরণ-তীর্থের যাত্রী, মায়ের কোলের শিশু
একাকার নির্মম বিচারে !
মোদের ভাবনা-ভয় মিছা রে।

কে জেনেছে সবখানি আকাশে ?
অনন্ত জীবনে মোর খণ্ড খণ্ড তার পরিচয়,
অসম্পূর্ণ প্রাণ-মৃত্যু কান্না-হাসি সম্ভব-বিলয়,
রহস্যের যবনিকা আজো উঠিল না মোর,
যাহা বুঝি, বুঝি শুধু আভাসে।
কে জেনেছে সবখানি আকাশে ?